ছোটদের পুরাণের গল্প

লীলা মজুমদার



ছোটদের পুরাণের গল্প

লীলা মজুমদার

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা।৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮৩
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০
দ্বিতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ১৯৮৬
বৈশাখ ১৩৯৩

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রক
পরেশ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

বারো টাকা

সূচী

সূচনা

আকাশে সপ্তর্ষি যে সাতটি উজ্জ্বল তারা দেখা যায়, তার মধ্যে একজন হলেন বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি ; শক্তির ছেলে পরাশর ; তার ছেলে ব্যাস। এই ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেছিলেন।

তাঁর মতো জ্ঞানী-গুণী আর নেই। যা কিছু হয়েছে, যা হচ্ছে আর যা হবে, সব তাঁর জানা। সাধারণ মানুষ যে কত মূর্খ, তাই দেখে ব্যাসদেবের বড় দয়া হল। তিনি তাদের জন্য আশ্চর্য সুন্দর এক কাব্য রচনা করলেন। সেই কাব্যে জ্ঞান; ধর্ম, শাস্ত্র, ইতিহাস সব কিছুর সার-মর্ম সহজ ভাষায় ধরা আছে। তার-ই নাম মহাভারত।

মহাভারত বলতে শুধু পঞ্চপাণ্ডবদের কাহিনী বোঝায় না। তাতে বেদ-বেদাঙ্গ, উপনিষদ, পুরাণ, ইতিহাস, সব কিছু আছে। কিন্তু কাব্য রচনা হল মনে মনে, এখন এত কথা লিখবার লোক কোথায় পাওয়া যাবে ?

ব্যাসের বাবা ব্রহ্মা। তিনি এসে বলে গেলেন এ কাজ গণেশের-ই উপযুক্ত, তাঁকে মনে মনে ডাকলেই তিনি আসবেন। এলেন-ও তাই সব কথা শুনে গণেশ বললেন, আমি খুশী হয়েই এই আশ্চর্য কাব্য লিখে দেব। আপনি যেমন যেমন মুখে বলে যাবেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে লিখে যাব। দেখবেন যেন আমাকে অপেক্ষা করতে না হয়।

ব্যাস বললেন, 'বেশ, তাই হবে। কিন্তু আমারও একটা কথা আছে। না বুঝে কিছু লিখতে পারবেন না।' গণেশ তাতে রাজি হয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন। ব্যাস মনে মনে কাব্য তৈরী করেন আর বলেন। সঙ্গে সঙ্গে গণেশ লিখে ফেলেন। মাঝে মঝে খটমট ভাষায় কঠিন শ্লোক বলেন, গণেশকে একটু ভাবতে হয়, সেই সুযোগে ব্যাস মনে মনে আরো অনেক শ্লোক তৈরী করে ফেলেন। এইভাবে সব জ্ঞানের ভাণ্ডার মহাভারত লেখা হয়েছিল।

এতে অপূর্ব সব গল্প আছে। তার কিছু কিছু এখানে দেওয়া হল।

বৈবস্বত মনু ও আশ্চর্য মাছ

সত্যযুগে বৈবস্বত মনু বলে এক মুনি ছিলেন। সেকালে তাঁর মতো সুন্দর আর মহৎ মুনি আর ছিল না।

একদিন চারিণী নদীতে স্নান করে, ভিজে কাপড়ে, জটা মাথায় তিনি তপস্যা করতে বসলেন। তাঁর মতো তপস্বীও সেকালে ছিল না।

মহামুনি তপস্যা করছেন, এমন সময় একটা ছোট্ট মাছ তাঁর কাছে এল। সে এত ছোট যে খালি চোখে তাকে ভালো করে দেখা যায় না। সেই খুদে মাছ তার ছোট্ট পাখনা ছুটি জোড় করে মুনিকে বলল, 'মুনি-ঠাকুর, আমাকে বাঁচান।'

অত ছোট মাছের কথা শুনে মনুর ভারি দয়া হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করতে হবে বল, বাছা।'

মাছ বলল, 'এখানে থাকলে বড় মাছরা আমাকে খেয়ে ফেলবে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান। আমি আপনার উপকার করব।'

মাছের কথা শুনে মুনির হাসি পেলেও, ছুই হাত জোড় করে জলসুদ্ধ মাছটিকে তুলে বাড়ি নিয়ে গেলেন। বাড়ি নিয়ে চমৎকার একটা শাদা কলসীতে জল দিয়ে তাকে রেখে দিলেন। তাকে খাবার-দাবার দিয়ে আদর করে পুষতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে খুদে মাছ একটু বড় হল। তারপর আরো একটু। তারপর আরো একটু। শেষটা কলসীতে আর তাকে ধরে না। তখন মাছ বলল, 'মুনিঠাকুর আমাকে এবার বড় জলে ছেড়ে দিন। এখানে আর আঁটছি না।'

বাড়ির কাছেই মস্ত দীঘি। তার ওপার দেখা যায় না। সেইখানে মুনি মাছটিকে ছেড়ে দিলেন। ক্রমে মাছ আরো বড় হতে লাগল। তারপর আরো বড়। তারপর তার চেয়েও বড়। শেষটা এমন দিন এল যখন দীঘিতে আর মাছের জায়গা হয় না।

মাছ বলল, 'ও মুনিঠাকুর, চেয়ে দেখুন আমি কত বড় হয়েছি। এখানে যে নড়াচড়ার জায়গা পাচ্ছি না। আমাকে আরো বড়

জলে নিয়ে যান।'

মুনির মতো দয়ালু কেউ ছিল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ মাছটিকে মাথায় তুলে নিলেন। বিশ্রী বুড়ো মাছ, গা-ভরা শ্যাওলা, তার মধ্যে শামুক, গুগলী আর সে কি বিকট গন্ধ। মুনি কিন্তু অনায়াসে তাকে মাথায় বয়ে নিয়ে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন।

তখন মাছের আনন্দ দেখে কে! মুনিকে সে বলল, 'সারা জীবন আপনি দয়া করে আমাকে প্রতিপালন করেছেন, এখন আমি তার প্রতিদান দেব। আমার কথা শুনুন, পৃথিবীর এক ভয়াবহ সর্বনাশের দিন আসছে। জলে ঝড়ে প্লাবনে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই দিনের জন্য এখন থেকে তৈরি হন। বিশাল একটা নৌকো বানান, এমন ভাবে যাতে তার তক্তার ফাঁক দিয়ে জল না ঢোকে। খুব মজবুৎ আর মোটা একটা দড়ি দিয়ে সেটাকে বেঁধে রাখুন।

তারপর ঐ নৌকোয় সব রকম ফল-ফুল-শস্য-গাছপালার বীজ নিয়ে আপনারা সকলে উঠে বসুন। সময়মতো আমিও এসে পৌঁছব। তখন দেখবেন আমার মাথায় একটা বড় শিং বেরিয়েছে।'

নৌকো তৈরি হল, ফল-শস্যের বীজ তোলা হল, মুনিরা চড়ে বসলেন। ঠিক তখন মাছ-ও এসে পৌঁছল। তার মাথায় শালগাছের মতো প্রকাণ্ড একটা শিং দেখা গেল। তার কথায় ঐ শিংটার সঙ্গে ঐ দড়িগাছা দিয়ে নৌকো বাঁধা হল।

তারপর চারদিক কালো মেঘ এল, ঝড় উঠল, ভীষণ বৃষ্টি নামল, নৌকোটা সাগরের জলে ঘুরপাক খেতে লাগল, কিন্তু ডুবল না। বিশ্ব-চরাচর ঐ ভীষণ ঝড়ে ডুবে গেল, সকলে প্রাণ হারাল। খালি ঐ নৌকোর আরোহীরা বাঁচল।

বৃষ্টি থামলে আস্তে আস্তে জল কমতে লাগল। প্রথমে হিমালয়ের চুড়ো দেখা দিল। মাছ বলল, 'ঐ চুড়োর সঙ্গে নৌকো বাঁধুন।' তাই করা হল। জল নেমে গেলে মুনিরা সকলে একে একে নেমে এলেন।

ঐ মাছ আসলে ব্রহ্মা। নিদারুণ প্রলয়ের সময় তিনি ছাড়া আর কে-ই বা রক্ষা করবে?

চ্যবনের বিয়ে

ভৃগুমুনির ছেলে চ্যবনকে লোকে মহর্ষি বলত। একবার তিনি বনের মাঝখানে দীঘির ধারে তপস্যায় বসলেন। সে বড় ভয়ানক তপস্যা। দিন মাস বছরের পর বছর ধরে সে তপস্যা চলেছিল। ঋষি নড়েন চড়েন না, ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই। দিন রাত অবিরাম এক জায়গায় বসে থেকে থেকে, ক্রমে তাঁর শরীর ধুলোমাটিতে ঢেকে গেল। তার উপর গাছ-গাছড়া গজাল। গাছে পিঁপড়েরা বাসা করল। তখন দেখতে হল যেন মস্ত একটা উইঢিবি।

স্থানীয় লোকেরা তাদের বাপ-ঠাকুরদাদের কাছে শুনেছিল ঐ উই-ঢিবি বড় পবিত্র জায়গা। ওর মধ্যে এক মহামুনি ধ্যানে বসে আছেন। তাঁর নাম চ্যবন।

এই ভাবে বহুকাল কেটে যাবার পর, একদিন বসন্ত কালে রাজা শর্যাতি তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে ঐ বনে উৎসব করতে এলেন। রাজার মেয়ে সুকন্যা আর অন্যান্য ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আনন্দে বনের মধ্যে খেলা করে বেড়াতে লাগল।

সুকন্যা দেখতে যেমন সুন্দরী, সেইরকম বুদ্ধিমতীও বটে। মা-বাপের একমাত্র সন্তান, তাঁদের বড়ই আদরের ধন। সখীদের সঙ্গে বনে বেড়াতে বেড়াতে সুকন্যা ঐ উইঢিবির কাছে এলেন। উইঢিবির মধ্যে মুনি। তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়ে গেছে, খালি চোখের কাছটায় একটু ফাঁক। সবে ধ্যান ভেঙেছে, সেই ফাঁক দিয়ে তিনি দেখলেন সরল নিষ্পাপ পরমাসুন্দরী এক মেয়ে। তাই দেখে তাঁর মন স্নেহে গলে গেল। ভাবলেন ওর সঙ্গে দুটো কথা বলি।

রাজকন্যা কখনো উইঢিবি দেখেননি। তার মধ্যে যে মহর্ষি চ্যবন রয়েছেন, তাও জানেন না। কাছে গিয়ে দেখেন উইঢিবির ফাটলে দুটি কি জিনিস চকচক করছে। সে দুটি যে মুনির চোখ, এ কথা রাজকন্যা স্বপ্নেও ভাবেননি। তাঁর হাতে বুনো গাছের একটা লম্বা কাঁটা ছিল।

তিনি তাই দিয়ে খুঁচিয়ে চকচকে জিনিস দুটিকে বের করার চেষ্টা করলেন।

তাতে মুনির যে কি রকম যন্ত্রণা হল তা সহজেই বোঝা যায়। চার-দিকে মাটির বাঁধন, একটু নড়ে উঠতেও পারলেন না। বহুকাল জল পান করেননি, গলা শুকিয়ে কাঠ, এতটুকু শব্দ পর্যন্ত বের হল না। খুবই রাগ হয়েছিল তাঁর, তবু ঐ সুন্দরী কিশোরীকে শাপ দেননি। তাঁর রাগ অন্য ভাবে প্রকাশ পেল। দলের সঙ্গে রাজার যে সৈন্য-সামন্ত ছিল, তারা হঠাৎ কোনো অজানা রোগে পাগলের মতো হয়ে উঠতে লাগল।

রাজার তো চক্ষুস্থির! তিনি বারবার লোকজনদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'তোমরা কোনো ভাবে মহর্ষিকে অপমান করনি তো? হয়তো তাঁর শাপ লেগেছে।' লোকজনরা কেউ উইঢিবির কাছে যায়নি।

সুকন্যা যখন শুনলেন উইঢিবির মধ্যে চ্যবন আছেন, তাঁর বুক কেঁপে উঠল। অমনি রাজাকে গিয়ে বললেন, 'বাবা', এ আমার কাজ। আমি বুঝতে না পেরে, উইঢিবিতে কি চকচক করছে দেখবার জন্য, কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়েছিলাম। না জানি তাঁর কত কষ্ট হয়েছিল।'

ছুটে গেলেন রাজা, হাতজোড় করে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। কিন্তু মুনির রাগ তখনো পড়েনি। তিনি বললেন, 'তোমার ঐ দুরন্ত মেয়ের যদি আমার সঙ্গে বিয়ে দাও, তাহলে সকলেই ভালো হয়ে যাবে। নইলে এ-রোগ সারবার নয়।'

উইঢিবি থেকে মুনি যখন বেরিয়ে এলেন, দেখা গেল হয়তো তাঁর হাজার বছর বয়স, তপস্যার জ্বালায় শরীর শুকিয়ে উইয়ে খাওয়া কাঠের মতো হয়ে গেছে। ওঁরই সঙ্গে ঐ নিষ্পাপ সুন্দরী কিশোরীর বিয়ে! ভাবতেই সকলের গা শিউরে উঠল।

কিন্তু মুনিও ছাড়বার পাত্র নন। তখন সুকন্যা যে কত অসাধারণ, সেটা বোঝা গেল। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'কি এত ভাবছেন, বাবা? ওঁকে এত ব্যথা দিয়েছি, তবু আমাকে যে শাপ না দিয়ে, বিয়ে করতে চেয়েছেন, সে তো আমার সৌভাগ্য। আমি খুশি হয়ে ওঁকে

বিয়ে করব।'

শেষ পর্যন্ত তাই হল। উপযুক্ত ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। হাসিমুখে সুকন্যা তপস্বিনীর পোশাক পরে স্বামীর সঙ্গে বনে চলে গেলেন। সেখানে স্বামীর সেবায় আর দেবতার আরধনায় তিনি সুখেই ছিলেন।

এর মধ্যে এক দিন স্বর্গের বৈদ্য, দুই অশ্বিনীকুমার ঐখান দিয়ে যেতে যেতে দেখেন ঋষির কুটিরের সামনে পরমাসুন্দরী এক তপস্বিনী। তাঁরা লোক বড় ভালো ছিলেন না। অমনি সুকন্যাকে লোভ দেখাতে লাগলেন যে তাঁদের সঙ্গে স্বর্গে গেলে, তাঁর সুখের আর শেষ থাকবে না।

বোঝাই যাচ্ছে সুকন্যা তাঁদের কড়া কথা বলে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বৈদ্যরা চালাক কম ছিলেন না। তাঁরা বললেন, 'বেশ, তাহলে তোমার বুড়ো স্বামীকে সুদর্শন যুবক বানিয়ে দিই। আমাদের ওষুধ জানা আছে। মুনিকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার।'

চ্যবন কোনো আপত্তি করলেন না। তখন অশ্বিনীকুমাররা বললেন, 'তাহলে এই পুকুরে একবার ডুব দিন তো।' তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও জলে নেমে গেলেন। তিনজন যখন জল থেকে উঠে এলেন, তখন তাঁদের অবিকল এক চেহারা, আলাদা করে চিনবার জো নেই। সুকন্যা কিন্তু ঋষির স্নিগ্ধ সস্নেহ পবিত্র চোখের চাহনি দেখেই নিজের স্বামীকে চিনে নিলেন।

অশ্বিনীকুমাররা ভেবেছিলেন তাঁদের একজনকে স্বামী বলে ভুল করে সুকন্যা হয়তো তাঁদের সঙ্গে স্বর্গে যাবেন। তাঁদের মতলব বুঝতে পেরেও চ্যবন তাঁদের ক্ষমা করলেন। উপরন্তু বললেন, 'তোমরা আমার রূপ-যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছ বলে আমি এত খুশি হয়েছি যে কথা দিলাম তোমাদের জন্য সোমরসের ভাগ এনে দেব।' এ-কথা শুনে খুশি হয়ে তাঁরা চলে গেলেন। বৈদ্যরা জাতে নিচু বলে স্বর্গে তাঁরা সোমরস পেতেন না।

সুখবর শুনে সুকন্যার বাবা শর্যাতি আনন্দ রাখার জায়গা পান না।

অমনি সেখানে ছুটে এলেন। চ্যবন তাঁর জন্য একটা মহাযজ্ঞ করলেন। সেই যজ্ঞে দেবতারা এসেছিলেন। তাঁদের জন্য হাঁড়ি হাঁড়ি সোমরস তৈরি হয়েছিল। তাঁরা আনন্দের সঙ্গে পান-ও করেছিলেন।

কিন্তু চ্যবন যখন দুটি বাটিতে সোমরস ঢেলে, তাঁর কথামতো অশ্বিনীকুমারদের দিতে গেলেন, অন্য দেবতারা বাধা দিলেন। চ্যবন তাঁদের কথা শুনছেন না দেখে ইন্দ্র তাঁকে মারবার জন্য বজ্র তুললেন। চ্যবন একটা মন্ত্র পড়ে যজ্ঞের আগুনে একটু ঘি ঢালতেই, বিকট এক দৈত্য বেরিয়ে ইন্দ্রকে আরেকটু হলেই চেটে খেয়েই ফেলত। ভাগ্যিস তিনি শেষ মুহূর্তে চ্যাচাতে লাগলেন, 'ও ঠাকুরমশাই! আমাকে বাঁচান! অশ্বিনীকুমাররা সোমরস খাবে, খাবে!'

তখন চ্যবন দৈত্যকে তুলে নিলেন, ইন্দ্রও বাঁচলেন আর অশ্বিনী-কুমাররাও সোমরসের ভাগ পেলেন। চ্যবন সুকন্যাকে নিয়ে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

চ্যবনের দাম

প্রয়াগে গঙ্গা আর যমুনা এক সঙ্গে মিলে যায়। তাকে বলে সঙ্গম। জায়গাটাকে পবিত্র স্থান মনে করে হাজার হাজার লোক তীর্থ করতে আসে। একবার মহর্ষি চ্যবন সঙ্গমের জলে নেমে ধ্যান করতে লাগলেন। বারো বছর কেটে গেল। তাঁর সারা গা শ্যাওলা আর শামুকে ঢেকে গেল। মাছরা তাঁর চারদিকে সাঁতরে বেড়াত, তাঁকে একটুও ভয় পেত না।

এমন সময় এক দল জেলে এসে ঠিক ঐ জায়গায় প্রকাণ্ড বড় জগৎ-বেড় জাল ফেলল। জেলেদের হাতের টানে জালের মুখ ক্রমে ছোট হয়ে এল। তাতে কত যে জলের জীব ধরা পড়ল তার ঠিক নেই। মাছ, কচ্ছপ, কুমীর আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত দেখতে এক মুনি। সে মুনি চ্যবন ছাড়া কেউ নয়।

শ্যাওলায় ঢাকা মাথা থেকে পা পর্যন্ত, তার উপরে শামুকের বাসা,

চিনবে কার সাধ্য। তবু মুনিকে দেখে ভয়ে জেলেদের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে তারা তাঁকে প্রণাম জানাতে লাগল। চ্যবনের সেদিকে চোখ ছিল না। তিনি দেখছিলেন ডাঙায় পড়ে মাছগুলোর কি কষ্ট! মনের দুঃখে চ্যবন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

জেলেরা তখন সাহস করে বলল, 'ঠাকুর, না বুঝে দোষ করেছি। এখন কি করলে আপনি খুশি হবেন তাই বলুন।'

চ্যবন বললেন, 'দেখ, অনেক দিন এই মাছদের সঙ্গে বাস করেছি, ওদের উপর বড় মায়া পড়ে গেছে। হয় ওদের সঙ্গে আমাকেও বিক্রি করে দাও, নয় এইখানে ওদের সঙ্গে মরি।'

জেলেরা কি করবে ভেবে না পেয়ে মহারাজ নহুষের কাছে গিয়ে সব কথা বলল। রাজা অমনি নদীর ধারে ছুটে এলেন, 'ভগবান, কি করতে হবে বলুন।'

মুনি বললেন, 'এই জেলেরা অনেক খেটেছে, তুমি ওদের কাছে মাছদের আর আমার দাম দিয়ে দাও।'

রাজা বললেন, 'আপনার জন্য এক হাজার টাকা দিই, তাহলে?'

মুনি আশ্চর্য হলেন, 'আহা ন্যায্য দাম দাও।'

রাজা বললেন, 'তবে এক লক্ষ টাকা দিই?'

মুনি বললেন, 'তাও যথেষ্ট নয়। অমাত্যদের জিজ্ঞাসা করে দাম ঠিক কর।'

নহুষ বললেন, 'তাহলে জেলেদের এক কোটি টাকা, কি তারও বেশি দিই?'

চ্যবন বললেন, 'তাতে হবে না। ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা কর।'

তখন রাজা বললেন, 'অর্ধেক রাজ্য কিম্বা সমস্তটাই দিয়ে দিই?'

চ্যবন তাতে রাজি নন, 'ঋষিদের সঙ্গে পরামর্শ কর।' নহুষ ভেবে পাচ্ছিলেন না সমস্ত রাজ্যের চেয়ে বেশি আর কি দেওয়া যায়। এমন সময় একজন পরম জ্ঞানী ঋষি সেখানে এলেন।

তিনি সব শুনে বললেন, 'টাকা কড়ির চেয়ে গরুর দাম ঢের বেশি। তাই দিয়ে দেখুন।'

চ্যবন এতক্ষণ মাছের গাদার উপর পড়ে ছিলেন। রাজা এসে বললেন, 'মুনিঠাকুর, আমি গরু দিয়ে আপনাকে কিনলাম। ঠিক দাম হল তো?'

মুনিও খুশি হয়ে উঠে এলেন, 'হ্যাঁ, মহারাজ, এবার ঠিক দাম হয়েছে।'

রাজার লোকরা একটা গরু এনে জেলেদের দিতেই, জেলেরা বলল, 'ঠাকুর, সাত পা চলতে যেটুকু সময় লাগে, সেটুকু সময়ও যদি সাধুসঙ্গে কাটানো যায়, তাহলে তাঁদের সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। এতটা সময় আমরা আপনার মতো মহাপুরুষের কাছে কাটালাম, আপনিও আমাদের আপনজন হয়ে গেছেন। দয়া করে এই গরুটি নিন।'

চ্যবনও সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'বাছারা, কারো মনে কষ্ট দিতে হয় না। আমি আনন্দের সঙ্গে গরুটি নিলাম। আর তোমরাও এই মাছদের সঙ্গে স্বর্গে গিয়ে অনন্ত কাল সুখে কাটাও।'

এই বলে গরুটি নিয়ে, রাজাকে আশীর্বাদ করে, ঐ ঋষির সঙ্গে মুনি চলে গেলেন।

ঔর্ব

সেকালে কৃতবীর্য বলে এক রাজা ছিলেন আর ভৃগু বলে এক মুনি ছিলেন। ভৃগু বংশীয়দের ভার্গব বলে। তাঁরা সর্বদা ঐ রাজাদের পৌরোহিত্য করতেন। রাজারাও তাঁদের মুক্ত হস্তে টাকাকড়ি ধনরত্ন দান করতেন। অনেক কাল ধরে এই নিয়ম চলে আসছিল, তার ফলে পুরোহিতদের ঘরে টাকার পাহাড় জমে গেছিল।

কোনো মানুষের সব দিন সমান যায় না। ঐ রাজাদের কোনো কাজের জন্যে একবার অনেক টাকার দরকার হয়েছিল। সকলেই জানতেন ভার্গবদের কাছে অনেক ধনরত্ন টাকাকড়ি জমা আছে। অসুবিধায় পড়ে রাজারা তাঁদের কাছে টাকা চাইলেন।

বেশি টাকার মালিক হলে অনেক সময় মানুষ স্বার্থপর হয়ে যায়।

এঁদেরও তাই হয়েছিল। কয়েকজন কিছু টাকা দিলেও, ভার্গবদের অনেকেই লুকিয়ে টাকা পুঁতে রেখে বলতে লাগলেন তাঁদের ঘরে কিছুই নেই।

ক্ষত্রিয়রা আর যাই হন, বোকা ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে একজন খুঁজে খুঁজে সেই লুকানো টাকার সন্ধান পেলেন। দেখতে দেখতে মাটি খুঁড়ে রাশি রাশি টাকা বের করাও হল। ব্যাপার দেখে রাজারা অবাক হয়ে গেলেন।

ভার্গবরা কিন্তু বেজায় চটে গেলেন। তাঁরা ক্ষত্রিয়দের এই কাজের জন্য নানা কড়া কথা বললেন, এমন কি অপমান করতেও ছাড়লেন না। ফলে যা হবার তাই হল। ক্ষত্রিয়রা তীরধনুক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভার্গবদের আক্রমণ করলেন।

পুরোহিতের বংশধররা তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন। দেখতে দেখতে তাঁরা ভার্গবদের মেরে-কেটে শেষ করে দিলেন। এমন কি মায়ের কোল থেকে ছোট ছেলেকে পর্যন্ত টেনে হত্যা করলেন। ক্ষত্রিয়দের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ভার্গবদের স্ত্রীরা আর মেয়েরা হিমালয় পাহাড়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

সব ভার্গব কিন্তু মারা যাননি। একজন মেয়ে তাঁর ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে যেমন করে হোক পালিয়ে বেঁচেছিলেন। ছেলেটির নাম ঔর্ব। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখা যেত। তখনো তাঁর বয়স খুবই কম, এমন সময় কেমন করে খবর পেয়ে, ক্ষত্রিয়ের দল তাকে মারবার জন্য সেই পাহাড়ের দেশে উপস্থিত হলেন।

তাঁদের স্পর্ধা দেখে ঔর্বের গা জ্বলে গেল। মায়ের কাছ থেকে সরে এসে তিনি একবার শুধু ক্ষত্রিয়দের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চোখ অন্ধ হয়ে গেল।

তখন ক্ষত্রিয়দের দুরবস্থার কথা ভাবা যায় না। অচেনা দুর্গম জায়গা, কোথাও খাদ কোথাও পাহাড়। কি খাবেন, কোথায় আশ্রয় পাবেন, তার ঠিক নেই। তার উপর চোখে দৃষ্টি নেই।

ক্ষত্রিয়রা ঔর্বের মায়ের কাছে কেঁদে পড়লেন, 'মা, আমরা মহাপাপী!

আমাদের উচিত শিক্ষাই হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি দয়া করে আমাদের চোখ ফিরিয়ে না দেন, আমরা দলেবলে মারা পড়ব।'

মা বললেন, 'আমি তো এ বিষয়ে কিছুই জানি না, বাছারা। বোধ হয় আমার ছোট ছেলেটার কোপ দৃষ্টিতেই তোমাদের এই সর্বনাশ হয়েছে। এ যে সে ছেলে নয়। জন্মাবার আগেই ওর বেদজ্ঞান লাভ হয়েছিল। ওকে খুশি করলে ও হয়তো তোমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবে।'

তখন ক্ষত্রিয়রা ঔর্বের কাছে গিয়ে কেঁদেকেটে ক্ষমা চাইলেন। ঔর্ব তাঁদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন আর তাঁরাও লজ্জায় মাথা নিচু করে করে যে যার ঘরে ফিরে গেলেন।

ঐ ক্ষত্রিয়দের ক্ষমা করলেও ঔর্বের মন থেকে রাজাদের উপর রাগ যায়নি। কি নিষ্ঠুর ভাবে তাঁরা নির্দোষ ভার্গবদের মেরে ফেলেছিলেন, এ কথা ভাবলেও ঔর্বের মনে যেন আগুন ধরে যেত।

কিছুতেই তাঁর রাগ আর দুঃখ দূর হচ্ছিল না। ঔর্ব ঠিক করলেন এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিতে হবে। এই মনে করে তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। ব্যাপার দেখে তাঁর পরলোকবাসী আত্মীয়স্বজন পূর্বপুরুষরা এসে বললেন, 'বাছা, আমরা যেখানে আছি সেখানে রাগ দুঃখ বলে কিছু নেই। তুমিও সৃষ্টি ধ্বংস করতে চেয়ো না। তাতে আমরা খুশি হতে পারছি না। এতে তোমার তপস্যা বিফল হচ্ছে। মন থেকে রাগ দূর কর।'

ঔর্ব বললেন, 'আমি যে সেই সর্বনাশের সময়ের মা-দের বুক ফাটা কান্নার কথা ভুলতে পারছি না। আমার সেই রাগ দুঃখ যে সত্যিকার আগুন হয়ে আমার বুকে জ্বলছে। এ আগুন ফেলি কোথায়?'

ঔর্বের বাপ-ঠাকুরদারা বললেন, 'সমুদ্রের জলে ফেলে দাও।'

তাই করলেন ঔর্ব। সেই রাগ সমুদ্রের জলে পড়ে প্রকাণ্ড একটা বিকট ঘোড়ার মুখের রূপ নিল। সেই ঘোড়ার মুখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। লোকে বলে সে আগুন নাকি এখনো নেবেনি। যাকে বাড়বানল বলে সে আসলে ঔর্বের রাগের আগুন ছাড়া কিছু নয়।

ঔর্ব নিজে কিন্তু ঐ আগুন ফেলে দিয়ে শান্তি পেলেন, স্বস্তি পেলেন।

অনেক কাল আগে দ্বারকা নগরের কাছে একটা খোলা জায়গায় যদু বংশের ছেলেরা খেলাধূলো করছিল। খেলতে খেলতে তাদের বড়ই জল তেষ্টা পেল। তারা তখন একটা ভালো নদী বা কুয়োর খোঁজ করতে লাগল।

খুঁজতে খুঁজতে বিশাল একটা পুরনো কুয়ো তাদের চোখে পড়ল। ছেলেরা মহা খুশি হয়ে সেখানে জড়ো হল। তারা একটা পাত্রের গলায় দড়ি বেঁধে তাড়াতাড়ি কুয়োর মধ্যে সেটি নামিয়ে দিল। দুঃখের বিষয় তবু জলের নাগাল পেল না। মনে হল একটা কোনো মস্ত জিনিস দিয়ে কুয়োর মুখ বন্ধ করা।

তাতে ছেলেদের বেজায় কৌতূহল হল। তারা ঠিক করল কুয়োর মুখে কি আছে দেখতেই হবে।

তখন সকলে মিলে অনেক কষ্টে কুয়োর মুখ থেকে বুনো গাছপালা লতা আগাছা কেটে সরিয়ে ফেলে দিয়ে, উঁকি মেরে দেখেই তাজ্জব বনে গেল। বিশাল এক গিরগিটি কুয়োর মুখ জুড়ে রয়েছে।

গিরগিটি মাথাটা উঁচুর দিকে করে মিটমিট করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। যাদবদের ছেলেরা ভয় পাবার পাত্রই নয়। তারা অমনি দড়ি আঁকশি ইত্যাদি এনে, তাই দিয়ে কুয়ো থেকে গিরগিটি তোলার চেষ্টা করতে লাগল।

কাজটা খুব সহজ ছিল না। গিরগিটি এঁটে বসে রইল, এক চুল নড়ল না। ছেলেরা কি করবে ভেবে না পেয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে কৃষ্ণকে সব কথা বলল। কৃষ্ণ ছুটে এলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি টেনেটুনে গিরগিটিকে উপরে তুললেন। সেই প্রকাণ্ড গিরগিটিকে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি?' গিরগিটি মানুষের মতো কথা বলল, 'পৃথিবীতে আমার নাম ছিল রাজা নৃগ।'

কৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন, 'কি অদ্ভুত কথা বলছ তুমি! নৃগ বড়

ধার্মিক রাজা ছিলেন, যেমন ন্যায়বান তেমনি দয়ালু। তিনি কেন গিরগিটি হতে যাবেন ?'

গিরগিটি বলল, 'হে কৃষ্ণ, সত্যিই আমি যথাসাধ্য ধর্মের পথেই চলতাম। কিন্তু একবার না জেনে একটা পাপ কাজ করেছিলাম, তাই এই গিরগিটি জীবন।'

কৃষ্ণ বললেন, 'কি রকম পাপ ?'

গিরগিটি বলল, 'আমাদের রাখাল যখন আমার গরুগুলোকে চরাতে নিয়ে গেছিল, এক ব্রাহ্মণের একটা গরু কি করে আমার গরুর পালের মধ্যে মিশে গেছিল। রাখালও কিছু লক্ষ্য করেনি। আমিও না জেনে ঐ গরুটাকে আরেক ব্রাহ্মণকে দান করেছিলাম। এদিকে গরুর মালিক নিজের গরু চিনতে পেরে ঐ ব্রাহ্মণের সঙ্গে মহা ঝগড়া করতে লাগল। আমার ব্রাহ্মণ বলল, "সে কি কথা! এ গরু স্বয়ং রাজা আমাকে দান করেছেন। এ গরু তোমার হতেই পারে না।" এই ভাবে ঝগড়া করতে করতে তারা আমার কাছে এসেছিল। আমি দেখলাম ব্রাহ্মণ হয়তো সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু যা দান করেছি তা ফিরিয়ে নিতে আমার মন সরছিল না, তবু তাকে বললাম, "এ গরুটা বোধ হয় সত্যিই এই লোকটির। ওর গরু ওকে নিয়ে যেতে দিন, আমি তার বদলে আপনাকে দশ লক্ষ গরু দিচ্ছি।"

কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না দেখে, গরুর মালিককে বললাম, "আপনি গরুটা ছেড়ে দিন, তার বদলে অনেক হাজার গরু দেব।" সে খুব বিরক্ত হয়ে বলল, "আমার ঘরে যথেষ্ট জিনিসপত্র আছে। রাজা কবে দান করবেন সেই আশায় আমি বসে থাকি না। আমার গরুটি ফিরিয়ে দিন, আমি চলে যাই।"

তা তো হয় না। তার বদলে তাকে আমি অনেক ধনরত্ন, দামী-দামী জিনিস দিতে চাইলাম, সে কিছুই নিল না। রাগ করে চলে গেল।

এই ঘটনার অনেক পরে আমার সময় হলে আমি যমের কাছে হাজির হলাম। তিনি বললেন, "তোমার অনেক পুণ্য, আর ঐ একটি পাপ। পুণ্যের ফল আগে চাও, না পাপের ?"

আমি বললাম, "পাপের ফলই আগে চাই।" বলবামাত্র দেখি আমি গিরগিটি হয়ে কুয়োর মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। পড়তে পড়তে শুনতে পেলাম যম বলছেন, "এক হাজার বছর পর কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করবেন। তখন তুমি স্বর্গে যাবে।"

সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ থেকে রথ নেমে এল। নৃগের গিরগিটি চেহারা ঘুচে গেল। তিনি আলোর মত রূপ ধরে রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন। ছেলেরাও কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরল।

ক্ষুপ আর দধীচের কথা

ক্ষুপ মানে হাঁচি। বহু প্রাচীন কালে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার হাঁচি থেকে নাকি ক্ষুপ রাজা জন্মেছিলেন। তাঁর ভীষণ তেজ ছিল। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইন্দ্র তাঁকে শত্রু মারবার জন্য নিজের বজ্র দেন।

অসুরদের হারিয়ে দেবার পর নিজের ইচ্ছায় ক্ষুপ মানুষ হয়ে জন্মেছিলেন। কিন্তু ঐ সাংঘাতিক তেজ যাবে কোথায়, দেখতে দেখতে তিনি পৃথিবীর রাজা হয়ে উঠলেন। দধীচ মুনির সঙ্গে তাঁর বড় ভাব ছিল।

এক দিন কথায় কথায় ক্ষুপ বললেন ক্ষত্রিয়ের আসন ব্রাহ্মণের উপরে। দধীচ এ কথা মানলেন না। তিনি বললেন ব্রাহ্মণই সবার বড়। তর্ক করতে করতে গরম হয়ে উঠে দধীচ ক্ষুপের মাথায় ভয়ঙ্কর এক ঘুঁষি মারলেন। ক্ষুপের তেজের কথা তো সকলেই জানে। অসহ্য অপমানে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে তিনি বজ্রের সাহায্যে দধীচের শরীর ভেঙে চুরমার করে দিলেন।

শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী মন্ত্র জানতেন। ভগ্নদেহে মাটিতে পড়ে দধীচ তাঁকে ডাকলেন। শুক্রাচার্য তাঁকে আবার সুস্থ করে দিয়ে, এই পরামর্শ দিলেন, 'তুমি শিবের পূজো করে তাঁকে খুশি কর। তারপর অমরত্ব বর চেয়ে নাও। তাহলে তুমি নিজে না মরতে চাইলে, কেউ তোমাকে মারতে পারবে না। তা ছাড়া আরো প্রার্থনা কর যে তোমার শরীরের হাড়গুলো যেন বজ্রের মতো কঠিন হয়।'

দধীচ তাই করলেন। শিব তাঁকে ঐ দুটি বরও দিলেন। তখন দধীচ গেলেন ক্ষুপের রাজসভায়, প্রতিশোধ নেবার জন্য। গিয়েই তাঁর মাথায় ভীষণ জোরে পদাঘাত করলেন। রাগে অন্ধ হয়ে ক্ষুপও তাঁর বুকে বজ্র মারলেন। কিন্তু তাতে দধীচের এতটুকু ক্ষতি হল না। দধীচের শক্তি দেখে ক্ষুপের মুখে আর কথা ফুটল না।

এবার ক্ষুপও বিষ্ণুর তপস্যা আরম্ভ করলেন। সে বড় ভয়ানক তপস্যা। বিষ্ণু খুশি হয়ে ক্ষুপকে বর দিতে চাইলেন। তখন ক্ষুপ বললেন, 'এক সময় দধীচ মুনির সঙ্গে আমার বড় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বাস্তবিকই একজন মহাপুরুষ। মহাদেবের বরে তাঁকে কেউ মারতে পারে না। তিনি কিন্তু আমার সভায় এসে সকলের সামনে আমার মাথায় পদাঘাত করেছেন, আবার দম্ভ করে বলেছেন—আমি কাউকে ভয় করি না! আমি তাঁকে পরাজিত করে অপমানের শোধ নিতে চাই। কি করে তা সম্ভব হবে আপনি বলে দিন।'

বিষ্ণু মহা সমস্যায় পড়ে বললেন, 'তা কি করে হতে পারে ভেবে পেলাম না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখব।'

এই বলে বিষ্ণু ব্রাহ্মণ সেজে দধীচের আশ্রমে গিয়ে বর চাইলেন। দধীচ তাঁকে তখনি চিনতে পেরে বললেন, 'শিবের বরে আমি সত্যিই কাউকে ভয় করি না। ভয়ের কোনো কারণ থাকলে বলুন।'

বিষ্ণু বিরক্ত হলেন, 'আমি বলছি তুমি ক্ষুপের রাজসভায় গিয়ে একবার শুধু বলে এসো—আমি খুব ভয় পেয়েছি। তাহলেই হবে।'

দধীচ বললেন, 'সে আমি পারব না।' রেগেমেগে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র তুললেন। চক্র নেতিয়ে পড়ল। দধীচ বললেন, 'শিবের দেওয়া অস্ত্র আমাকে আঘাত করবে না। অন্য কিছু দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

বিষ্ণু এবার যত রকম মহাস্ত্রের কথা মনে পড়ল, সব দিয়ে চেষ্টা করলেন। দেবতারা সকলে তাঁকে সাহায্য করতে এলেন। দধীচ এক মুঠো ঘাস তুলে শিবের নাম মনে করে ছুঁড়ে দিলেন। ঘাসের মুঠো ত্রিশূল হয়ে দেবতাদের দিকে ছুটে এল। তাঁরা যত অস্ত্র দধীচকে ছাড়েন, সব অস্ত্র দধীচকে কোথায় আঘাত করবে, তার বদলে ত্রিশূলকে প্রণাম

করে! তাই দেখে দেবতারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

বিষ্ণু আর কি করেন, নিজের শরীর দিয়ে মহা মহা যোদ্ধা সৃষ্টি করলেন। দধীচের তেজে সবাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল! এর পর স্বয়ং ব্রহ্মা এসে যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। বিষ্ণুও আর কিছু করতে না পেরে, মুনিকে নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

ততক্ষণে ক্ষুপ রাজার সব রাগ জল হয়ে গেছিল। দধীচের অসীম ক্ষমতা তিনি মেনে নিয়ে ক্ষমা চাইলেন। দধীচ তাঁকে ক্ষমা করে বললেন, 'এবার দেখলে তো ব্রাহ্মণের শক্তি ক্ষত্রিয়ের শক্তির চেয়ে কত বেশি।' এই বলে নিজের আশ্রমে চলে গেলেন।

দধীচের আত্ম-ত্যাগ

দধীচ মুনির পরোপকার আর ত্যাগের সীমানা ছিল না। সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠেছিল দৈত্যরা তার ন্যায্য ভাগ পায় নি। দেবতারা নিজেরাই সবটুকু নিয়েছিলেন। এর ফলে দৈত্যদের ক্ষোভ আর শত্রুতা বেড়েই গিয়েছিল। দেবতারা অমৃত খেয়েও দৈত্যদের সঙ্গে সব সময় পেরে উঠতেন না। হয়তো তাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করার জন্যে দেবতাদের মনে কিছু অশান্তিও ছিল। ফলে অনেক সময় যুদ্ধে হেরে যেতেন, মাঝে মাঝে পালিয়েও যেতেন। তার উপর বৃত্র নামে কালেয় বংশের একজন দৈত্য যখন তাদের দলপতি হয়ে উঠলেন, তখন দেবতাদের অবস্থা আরো কাহিল হল। তাঁরা সকলে মিলে ব্রহ্মার স্তব করতে লাগলেন।

ব্রহ্মা দেখা দিয়ে বললেন, 'বৃত্রকে মারবার একমাত্র উপায় তোমাদের বলে দিচ্ছি। পৃথিবীতে দধীচ নামে একজন মহা মুনি আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে তোমারা তাঁর দেহের হাড়গুলি চেয়ে নাও। তাঁর মতো পরোপকারী পৃথিবীতে আর নেই। চাইলেই দিয়ে দেবেন। তারপর ঐ পবিত্র হাড় দিয়ে বজ্র নামে এক ভীষণ অস্ত্র গড়তে হবে। তাই দিয়ে বৃত্রাসুর হত হবে। অন্য উপায় নেই।'

এ-কথা শুনেই দেবতারা সরস্বতী নদীর ধারে দধীচের আশ্রমে

গিয়ে, মুনিকে প্রণাম করে বর চাইলেন। সব কথা শুনে দধীচ বললেন, 'আমার কাছে বর চেয়ে খালি হাতে ফিরে যাবেন, সে হতে পারে না।'

তারপর তিনি যোগাসনে বসে স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে দেহত্যাগ করলেন। দেবতারা এত বড় স্বার্থত্যাগ দেখে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর হাড় ক-খানি নিয়ে বিশ্বকর্মার কাছে গেলেন।

বিশ্বকর্মাও তাঁর সমস্ত দক্ষতা আর যত্ন দিয়ে এক আশ্চর্য অস্ত্র তৈরি করে দিলেন। ঐ অস্ত্রের ছয়টি কোণ, তাকে ছাড়লে এমন ভীষণ গর্জনের সঙ্গে সে ছুটে যায় যে ত্রিভুবন কাঁপে। অস্ত্রের নাম বজ্র।

অস্ত্র তৈরি হলে, ইন্দ্র সেটি হাতে নিয়ে, দলবল সহ আবার দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে নামলেন। দৈত্যরাও কম যায় না। সোনার কবচ পরে মহা বিক্রমে তারাও যুদ্ধে নেমে পড়ল। তাদের ঐ ভীষণ তেজ দেখে দেবতারা একে একে সরে পড়তে লাগলেন।

এদিকে বৃত্রাসুরের মনের অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা। ন্যায্য অধিকারের জন্য কালেয়রা লড়াই করছে। রাগে ফুলে বৃত্র পাহাড়ের মতো বিশাল আকার নিলেন। তাই দেখেই ইন্দ্র ভয়ের চোটে মূর্ছা গেছেন। গতিক দেখে বিষ্ণু তাঁকে নিজের খানিকটা তেজ দিলেন। ইন্দ্র আবার উঠে মনে মনে বললেন, 'এবার আর ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।' এই ভেবে বজ্র নিয়ে আবার বৃত্রের সামনে দাঁড়ালেন। বৃত্র তাঁকে দেখেই এমনি ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়লেন, যে ভয়ে দু-চোখ বুজে, বজ্র ছুঁড়ে দিয়ে, ইন্দ্র পিছন ফিরে পিট্টান দিলেন। তাতেও ভয় গেল না। শেষে একটা পুকুরে ডুব দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

বৃত্র কিন্তু ঐ ভয়ানক বজ্রের আঘাতেই প্রাণ হারিয়েছিলেন। দধীচের হাড়ে তৈরি অস্ত্র খেয়ে কে বাঁচবে? দেবতারাও ইন্দ্রের বীরত্বের জয়গান করতে করতে নতুন উৎসাহে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে দলপতিহীন দৈত্যরা পিছু হটতে হটতে একেবারে সমুদ্রের তলায় আশ্রয় নিল।

যুদ্ধে হেরে গিয়েও দৈত্যরা দমে যায় নি। সমুদ্রতলে বসে তারা ঠিক করল যে তপস্যার জোরেই শত্রুদের এত বেশি শক্তি। যদি সমস্ত

তপস্বী আর ধার্মিক লোকদের মেরে ফেলা যায়, তাহলে ল্যাঠা চুকে যায়।

এরপর তাদের অত্যাচারের আর দৌরাত্ম্যের আর শেষ রইল না। দিনের বেলায় দৈত্যরা সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে থাকত, রাতে বেরিয়ে মুনিঋষি সাধু-সজ্জন সবাইকে মেরে বেড়াত। পৃথিবীতে বাস করা ক্রমে অসম্ভব হয়ে উঠল।

এই সময়ে দেবতারা দল বেঁধে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, 'ভগবন্, আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো আশ্রয় নেই। এই নিদারুণ দুর্বিপাকে কি করা যায় বলে দিন। আমরা তো শত্রুদের সন্ধানই পাচ্ছি না।'

বিষ্ণু বললেন, 'দিনের বেলায় দৈত্যরা সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে থাকে, রাতে বেরিয়ে উৎপাত করে। সমুদ্রের জল শুষে ফেলা ছাড়া আমি উপায় দেখি না। একজন মাত্র লোক আছেন যাঁর সাহায্যে এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। তাঁর নাম মহামুনি অগস্ত্য। তোমরা তাঁর কাছে যাও।'

এই বলে বিষ্ণু তাদের বিদায় দিলেন।

কুশিকের ধৈর্য

সেকালে কান্যকুব্জে গাধি বলে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছেলে বিশ্বামিত্র পরম ধার্মিক ছিলেন। ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম নিয়েও তপস্যার বলে তিনি ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

শোনা যায় সেকালের মুনি-ঋষিরা যোগবলে ভবিষ্যতে কি হবে না হবে, সব জানতে পারতেন। বিশ্বামিত্র একদিন ব্রাহ্মণত্ব পাবেন এ-কথা তাঁর জন্মের অনেক আগেই ঋষিরা জেনেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁদের অনেকেই খুব বিরক্তও হয়েছিলেন।

গাধি দূরে থাকুক, গাধির বাবা কুশিক তখন কান্যকুব্জের রাজা। কবে বিশ্বামিত্র জন্মাবেন, তারপর তিনি ব্রাহ্মণ হবেন, এ-কথা ভেবে যাঁরা খুব বিরক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহর্ষি চ্যবনও ছিলেন।

চ্যবনের অসাধারণ বুদ্ধি ছিল। তিনি মনে মনে এক উপায় ঠাওরালেন। ঠিক করলেন কুশিকের বাড়িতে গিয়ে তাঁর অতিথি হবেন। অতিথি বলে অতিথি! অতিথি হয়ে কুশিক দিন-রাত কুশিককে এমনি জ্বালাতন করবেন। রাজা আর কত সহ্য করবেন? শেষ পর্যন্ত হাড় জ্বালাতন হয়ে, নিশ্চয় রেগেমেগে চ্যবনকে দুটো অপমানকর কথা বলবেন। আর চ্যবনও সুবিধা পেয়ে, তাঁকে শাপ দিয়ে নির্বংশ করবেন। তাহলে বিশ্বামিত্র হয়তো জন্মাবেন-ই না। কিংবা জন্মালেও তাঁকে বেশি দিন বাঁচতে হবে না, ব্রাহ্মণ হওয়া দূরে থাকুক।

এই রকম মতলব করে চ্যবন গিয়ে কুশিককে বললেন, 'ভেবেছি কিছুদিন তোমার কাছে থাকব।' এ-কথা শুনে কুশিক কৃতার্থ হলেন। নিজের হাতে মহর্ষির পা ধুইয়ে দিয়ে, সমাদর করে তাঁকে বসালেন। তারপর বললেন, 'মহর্ষি বলুন কি করতে হবে।'

চ্যবন বললেন, 'আমি একটা ব্রত করতে চাই। আমার ব্রত শেষ না হওয়া অবধি তুমি আর তোমার স্ত্রী সমস্তক্ষণ আমার সেবা করবে। এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে ছেড়ে যাবে না। যখন যা বলব, তখনি তাই করবে।'

রাজা রাণী ভাবলেন এটুকু করা তো তাঁদের কর্তব্য। যেই না সন্ধ্যা হল, চ্যবনের খিদে পেল। সে কি যে সে খিদে! রাজার বাড়িতে যা কিছু খাবার-দাবার পায়েস মিষ্টি ফলমূল ছিল, সমস্ত সাবাড় করে, সর্বনেশে মুনি বললেন, 'এবার আমি ঘুমোব। তোমরা আমার সেবা করবে। দেখো যেন ঘুম না ভাঙে।'

মুনি আরামের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন। রাজা-রাণী তাঁর পায়ে হাত বুলোতে, মাথায় পাখা করতে লাগলেন। একুশ দিন একুশ রাত মুনি ঘুমোলেন। রাজা-রাণীর স্নান খাওয়া বিশ্রাম ঘুম সব বন্ধ রইল।

একুশ দিন পর ঘুম থেকে উঠে চ্যবন বেড়াতে বেরোলেন। ঘুমের অভাবে খিদেয়, তেষ্টায় রাজা-রাণীর অবস্থার কথা ভাবা যায় না তবু তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মুনির ব্যবহার কিন্তু ভালো না। তাঁর জন্য রাজারাণী এত করছেন অথচ মুনির মুখে একটা কথা নেই। তাঁদের

দিকে তাকিয়ে দেখলেন না পর্যন্ত।

হঠাৎ মুনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভয়ে কাঠ হয়ে রাজারাণী তাঁকে অনেক খুঁজে, শেষে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে দেখেন, মুনি দিব্যি সুন্দর বিছানায় শুয়ে আবার ঘুমোচ্ছেন। রাজা-রাণী আবার তাঁর সেবায় লাগলেন। তাঁদের মনে বা মুখে এতটুকু রাগ বা বিরক্তি নেই।

হঠাৎ উঠে বসে মুনি বললেন, 'স্নান করব। তেল আনো।' তখুনি সুগন্ধী তেল এনে তাঁর গায়ে মাখানো হল। স্নানের ঘরে সব তৈরি। রাজা নিজে তাঁকে স্নান করাবেন। কিন্তু স্নানের ঘরে গিয়ে রাজা আর মুনিকে দেখতে পেলেন না। ব্যস্ত হয়ে এ-ঘরে এসে দেখেন মুনির স্নান সারা।

মুনি তাঁকে দেখে বললেন, 'বাড়িতে কি খাবার আছে, সব নিয়ে এসো।' বাড়িতে যা ছিল সব এল। খাওয়া দূরে থাকুক, মুনি করলেন কি, ঘরে যত দামী দামী বিছানাপত্র কাপড়-চোপড় ছিল, সব ঢিপি করে ঐ ভালো ভালো খাবারের উপরে চাপিয়ে, তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। তারপর নিজে অদৃশ্য হলেন।

তবু রাজা-রাণীর মুখে বা মনে এতটুকু বিরক্তি নেই। এই ভাবে নানা রকম নির্যাতনের মধ্যে উনপঞ্চাশ দিন কাটলে পর মুনি বললেন, 'আমি রথে চড়ে হাওয়া খাব। তুমি আর তোমার রাণী রথ টানবে।'

সেই ব্যবস্থাই হল। রাজা-রাণী রথের ঘোড়ার জায়গা নিলেন। রথ পথে বেরোল। মুনি আবার একটা ছুঁচলো লাঠি নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'রাজপথ দিয়ে চল। সঙ্গে টাকাকড়ি ধনরত্ন নাও। আমি সব বিলি করব।'

তাই করা হল। মুনি মাঝে মাঝে লাঠি দিয়ে রাজা-রাণীকে খোঁচাতে লাগলেন। প্রজারা তাই দেখে হাহাকার করতে লাগল। তাদের দেবতার মতো রাজা-রাণীর এ কি হাল হল! সেই সঙ্গে দু-হাতে মুনি ধনরত্ন বিলিয়ে দিতে লাগলেন। তবু রাজা-রাণী এতটুকু ধৈর্য হারালেন না। অবশেষে মুনি তাঁদের মহান চরিত্রের কাছে হার মানলেন।

তাঁদের দুজনকে মুক্তি দিয়ে, রাজাকে চ্যবন সব কথা খুলে বললেন।

শুনে রাজা-রাণী অবাক হলেন।

মুনি বললেন, 'আমি যে কত সন্তুষ্ট হয়েছি তা বলতে পারি না। বর চাও।'

রাজা বললেন, 'মুনিঠাকুর, আপনাকে যে খুশি করতে পেরেছি সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বর। যদি কোথাও কোনো ত্রুটি হত, তাহলেই তো আমি নির্বংশ'হতাম। এর বেশি বর নিয়ে আমরা কি করব ?'

মহর্ষি চ্যবন তাঁর সমস্ত রাগ বিরক্তি ভুলে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন। এর অনেক পরে, যথা সময়ে বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব পেয়েছিলেন।

অষ্টাবক্র

সেকালে উদ্দালক বলে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁর ছেলের নাম শ্বেতকেতু, মেয়ের নাম সুজাতা। তাছাড়া কহোড় নামে একজন শিষ্যও ছিলেন। কহোড়ের গুরুভক্তি দেখে খুশি হয়ে উদ্দালক তাঁকে সব বিদ্যার অধিকারী করে দিয়েছিলেন। পরে মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়েছিলেন।

এই কহোড়ের অতি আশ্চর্য একজন ছেলে হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই কহোড় একটা বডই রূঢ় কাজ করে ফেলেছিলেন। ঐ ছেলে মায়ের পেটে থাকতেই পরম জ্ঞানীগুণী হয়ে উঠেছিলেন।

এক দিন কহোড় তাঁর অন্য শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন, নানা কথা হচ্ছে। এমন সময় মায়ের পেটে থেকেই ছেলে বলে উঠল, 'বাবা, তুমি সারা রাত জেগে এত পড়াশুনা কর, তবু অনেক ভুল থেকে যায়।'

শিষ্যদের সামনে এমন কথা বলাতে রাগে অপমানে কহোড়ের মুখ লাল হয়ে উঠল। ছেলে জন্মাবার আগেই তিনি তাঁকে ভীষণ শাপ দিয়ে বললেন, 'বাপকে অপমান করার জন্য তোমার শরীর আট জায়গায় বাঁকা হবে।'

দুঃখের বিষয় ছেলে জন্মাবার আগেই কহোড় শোচনীয়ভাবে মারা গেলেন। ব্যাপারটা এই ভাবে হয়েছিল। তখন মিথিলায় জনক রাজত্ব

করছিলেন। তাঁর সভায় বন্দী নামে একজন সাংঘাতিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তর্কে কেউ হেরে গেলে, বন্দীর হুকুমে তাকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হত। কহোড়েরো ঐ দশা হল।

এদিকে যথাসময়ে বিধবা মায়ের কোলে অষ্টাবক্র জন্ম নিলেন। শিশুর বিকট চেহারা দেখে সকলে স্তম্ভিত। বাপের শাপের ফলে তার নাক মুখ চোখ কান হাত পা কোনটাই স্বাভাবিক ছিল না। ছেলের নাম হল অষ্টাবক্র। বাপের কথা তাঁকে জানতে দেওয়া হল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল উদ্দালক-ই তাঁর বাবা আর শ্বেতকেতু তাঁর দাদা। ছেলে ছুটিতে বড় ভাব,একসঙ্গে খেলাধূলো ও মাঝে মাঝে ঝগড়া-ঝাটিও হত।

দেখতে দেখতে জন্মগত প্রতিভায় আর উদ্দালকের যত্নে, অষ্টাবক্র অসাধারণ বিদ্বান হয়ে উঠলেন। আবার অনেক বিষয়ে ছোট ছেলের মতোই ছিলেন। একদিন তিনি উদ্দালকের কোলে চড়ে বসেছেন, শ্বেতকেতু তাঁকে টানাটানি করে নামাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অষ্টাবক্র কিছুতেই নামছেন না দেখে, বিরক্ত হয়ে শ্বেতকেতু বললেন, 'উনি তো আর তোমার বাবা নন্, আমার বাবা। তুমি কেন ওঁর কোলে বসবে ?'

শুনে অষ্টাবক্রের হাত-পা ঠাণ্ডা! ছুটে গেলেন মায়ের কাছে, 'মা, তাহলে আমার বাবা কোথায় ?' কাঁদতে কাঁদতে সুজাতা তাঁকে সব কথা বললেন। মায়ের কাছে বাবার দুঃখময় মৃত্যুর কথা শুনে, অষ্টাবক্র মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে তাঁর কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন।

মিথিলায় যেতে হবে। সেখানে জনক রাজা মস্ত যজ্ঞ করছিলেন। লক্ষ লক্ষ গরীব, দুঃখী, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ভিক্ষা পাবার আশায় সেখানে যাচ্ছিলেন। জনকের মতো দাতা কম ছিল। অষ্টাবক্র ঠিক করলেন, ভিক্ষার্থীদের দলে মিশে, রাজসভায় গিয়ে বন্দীকে তর্কে হারিয়ে, জলে ডুবিয়ে মেরে বাপের মৃত্যুর শোধ নেবেন। অষ্টাবক্রর বয়স তখন বারো বছর।

শ্বেতকেতুকে সঙ্গ নিলেন। তাঁকে সব কথা বললেন না, পাছে গুরুজনদের বলে বাধা দেয়। রাতে তাঁকে শুধু বললেন, 'আমাদের

বাড়িতে এত অভাব। ওদিকে জনকরাজা দু-হাতে ধন-রত্ন দান করছেন। চল, কিছু নিয়ে আসি। তাহলে চিরকালের মতো আমাদের অভাব ঘুচে যাবে।'

ভোরে রওনা হয়ে, পথের নানা দ্রষ্টব্য জায়গা দেখতে দেখতে তাঁরা মিথিলায় পৌঁছলেন। সেখানে দেখলেন রাজা জনক রাজপথ দিয়ে যজ্ঞের জায়গায় চলেছেন। রক্ষীরা হাঁকডাক করে পথ থেকে সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে। সরা দূরের কথা, অষ্টাবক্র স্বয়ং রাজাকে বললেন, 'মহারাজ পথে যতক্ষণ ব্রাহ্মণ না আসছে, ততক্ষণ সবার আগে যাবে অন্ধরা, তারপর কালারা, তারপর মেয়েরা, তারপর মোট বইছে যারা, তারপর যাবেন রাজা। আর ব্রাহ্মণ এলে সকলে তার জন্য পথ ছেড়ে দেবে। তাহলে আমাদের সরিয়ে, আপনার জন্য পথ করা হচ্ছে কেন?'

ছেলেটির জ্ঞানবিদ্যা দেখে জনক যেমন খুশি, তেমন আশ্চর্য হলেন। রক্ষীদের বললেন, 'ব্রাহ্মণকুমার ঠিক বলেছে, ওদের পথ ছেড়ে দাও।'

যজ্ঞের জায়গাতেও দ্বারপালরা প্রথমে ওঁদের যেতে দিতে চায়নি। ছোকরা ব্রাহ্মণ দেখলে বন্দী চটে যাবেন। খালি পণ্ডিতদের যাবার কথা।

অষ্টাবক্র বললেন, 'পণ্ডিত হলেই বুড়ো হতে হবে এমন কোনো কথা নেই।' তবু দ্বারপালরা কি সহজে মানতে চায়! অষ্টাবক্র বললেন, 'আমাদের বয়স কম দেখে এখন এত তাচ্ছিল্য করছ, যখন বুড়ো বন্দীকে তর্কে হারিয়ে দেব, তখন দেখবে!'

জনক রাজাও অষ্টাবক্রকে বন্দীর সাংঘাতিক স্বভাবের কথা বলে ঠেকাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অষ্টাবক্র নাছোড়। তখন তাকে পরীক্ষা করবার জন্য জনক নানা রকম কঠিন প্রশ্ন করতে লাগলেন। অষ্টাবক্র সব প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিলেন। তখন খুশি হয়ে রাজা তাঁকে বন্দীর কাছে যেতে দিলেন।

অষ্টাবক্রের তেজ দেখে কে! বন্দীকে ডেকে বললেন, 'এসো, তর্কে বসা যাক। আমি যা বলব, তুমি তার উত্তর দেবে। তুমি যা বলবে, আমিও তার উত্তর দেব। যে উত্তর দিতে পারবে না, তাকে জলে ডুবে মরতে হবে।'

বন্দী তর্কে নামতে রাজি হয়ে বললেন, 'আমি যা বলব তুমি তার বেশি বলবে। আমি তার চেয়েও বেশি বলব, তুমি তখন আমার চেয়েও বেশি বলবে। এইভাবে চলবে। যে বলতে পারবে না, সে হেরে গেল। তাকে জলে ডুবে মরতে হবে। আমি আরম্ভ করছি। সব আগুন একই জিনিস এক সূর্য, এক ইন্দ্র, এক যম।'

অষ্টাবক্র বললেন, 'ইন্দ্র আর আগুন হলেন দুই বন্ধু। নারদ আর পর্বত দুই দেবর্ষি। অশ্বিনীকুমাররা দুজন, রথের চাকা দুটি, স্বামী-স্ত্রী দুজন।'

তখন বন্দী যে-সব জিনিস তিনটি করে হয়, তার নাম বললেন। অষ্টাবক্র যে-সব জিনিস চারটি হয় তাই বললেন। তারপর চার থেকে পাঁচ, তারপর ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো অবধি বলা হল।

এবার অষ্টাবক্র বললেন, 'বছরে বারো মাস, জগতী ছন্দের একেক চরণে বারো অক্ষর, প্রাকৃত যজ্ঞ শোধ হয় বারো দিনে, আদিত্যরা বারোজন।'

এর উত্তরে বন্দী গোটা দুই নাম করে আর বলতে পারলেন না। তখন অষ্টাবক্র আরো অনেকগুলি উদাহরণ দিয়ে তর্কে জয়ী হলেন। কাজেই বন্দীকে এবার মৃত্যু বরণ করতে হবে। এতদিন পরে অষ্টাবক্র পিতৃহত্যার শোধ তুলতে পারবেন।

বন্দীকে কিন্তু এতটুকু দুঃখিত বা ভয় পেয়েছে মনে হল না। বরং সে বেশ আনন্দের সঙ্গে বলল, 'ওতে আমার একটুও ভয় নেই। আমি বরুণের ছেলে। আমার বাবাও জলের তলায় বারো বছর ধরে মহাযজ্ঞ করছেন। তাঁর অনেক ভালো ব্রাহ্মণের দরকার, তাই আমি তর্ক করার ছলে তাঁকে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাঠিয়েছি। তাঁরা কেউ মরেননি। আমার বাবা তাদের আদর যত্ন করেই রেখেছেন। অষ্টাবক্রও শীঘ্রই তাঁর বাবা কহোড়ের দেখা পাবেন।'

এই কথা বলতে বলতে বন্দীর আদেশে যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডুবে মরেছিলেন, তাঁরা সকলেই সুস্থদেহে জল থেকে উঠে এলেন।

কহোড় জনককে বললেন, 'আমি যা করতে পারিনি, আমার ছেলে

কেমন সহজেই তাই করল।'

বন্দীও জনকের কাছে বিদায় নিয়ে বললেন, 'এই ক বছর আপনার কাছে বড় সুখে ছিলাম। এখন বাবার কাছে ফিরে যাই।' এই বলে আনন্দের সঙ্গে সমুদ্রের জলে ডুব দিলেন।

জনক তখন কহোড়, অষ্টাবক্র আর অন্যান্য ব্রাহ্মণদের অনেক ধন-রত্ন দিলেন। তাঁরাও খুশি মনে বিদায় নিলেন। স্বামীকে আর ছেলেকে ফিরে পেয়ে সুজাতার কত আনন্দ হয়েছিল কল্পনা করা যায়।

তারপর কহোড় ছেলেকে বললেন, 'আমাদের আশ্রমের পাশের ঐ ছোট নদীটিতে স্নান করে এসো তো, বাছা।'

যখন জল থেকে উঠে এলেন অষ্টাবক্র, সকলে অবাক হয়ে দেখলেন কোথায় তাঁর সেই বাঁকা শরীর। তার বদলে অষ্টাবক্রের সব অঙ্গ সুন্দর আর সমান হয়ে গেছে। সেই থেকে ঐ নদীর নাম হল সমঙ্গা।

উশীনর

সেকালে শিবিবংশে উশীনর বলে এক রাজা ছিলেন। তাঁর মতো পুণ্যবান আর হয় না। একবার তিনি মহাযজ্ঞ করে ছিলেন। সে এত বড় যজ্ঞ যে ইন্দ্রও কখনো তেমন করেননি।

ইন্দ্র অগ্নিদেবকে বললেন, 'লোকে বলে উশীনরের মতো পুণ্যবান কেউ নেই। চলুন, তার ধর্মের দৌড় একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

এই বলে ইন্দ্র বাজপাখির চেহারা নিলেন আর অগ্নি হলেন একটি পায়রা। তারপর ঐ ছদ্মবেশী বাজপাখি পায়রাটিকে তাড়া করে, একেবারে উশীনরের যজ্ঞস্থলে এসে পৌঁছল।

বাজপাখির ভয়ে পায়রা গিয়ে একেবারে রাজা উশীনরের কোলে আশ্রয় নিল। আর বাজপাখিও রাজার কাছে দাবি করল,'আমার খিদের জিনিস আপনার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। ওকে ছেড়ে দিন,আমি খাব।'

রাজা বললেন, 'তা কি করে দিই ? যে আমার আশ্রিত সে আমার দেখতার মতো। তাকে ছাড়লে আমার পাপ হবে।'

বাজপাখি বলল, 'খেতে না পেলে আমি মরে যাব। আমি মরে গেলে বাসায় আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়েরাও না খেয়ে মরবে। আপনি কি একটা পাখিকে বাঁচাতে গিয়ে, এতগুলো প্রাণীর মরার কারণ হবেন?'

রাজা বললেন, 'অন্য জিনিস খেলেও তো তোমার প্রাণ বাঁচবে। তুমি যে রকম মাংস চাও আমি দিচ্ছি। শুধু পায়রা নয়।'

বাজপাখি বলল, 'বাজপাখিরা পায়রাই খায়। অন্য মাংস খায় না। কাজেই ঐ পাখিটাই আমাকে দিন।' রাজা, বললেন, 'তোমাকে আমার শিবিরাজ্য দিচ্ছি। নয়তো যদি অন্য কিছু চাও তো তাই দেব। কিন্তু প্রাণের ভয়ে এ আমার আশ্রয় নিয়েছে, একে ছাড়তে পারব না। অন্য কিছু চাও।'

বাজপাখি তখন বলল, 'বেশ, ওর ওপর আপনার যখন এতই মায়া, তখন ওর সমান ওজনের মাংস আপনার নিজের গা থেকে কেটে দিন।'

উশীনর এ কথায় আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে, নিজের গা থেকে মাংস কেটে, দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে পায়রার সঙ্গে ওজন করতে বসলেন। দেখতে অতটুকু হলেও পায়রার ওজন বড় কম ছিল না। উশীনরকে আরো অনেক খানি মাংস কাটতে হল। রক্তের গঙ্গা বইল। তবু পাখির সমান হল না।

এরপর রাজা যতই নিজের গা থেকে মাংস কেটে দাঁড়িপাল্লায় তোলেন, সে আর কিছুতেই পায়রার সমান হয় না। শেষটা নিজেই উঠে দাঁড়িপাল্লায় বসলেন। তখন বাজপাখি বলল, 'মহারাজ, আমি ইন্দ্র আর এই পায়রা অগ্নি। তুমি কত বড় ধার্মিক তাই পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। আমরা স্বীকার করছি তোমার মতো পুণ্যবান ত্রিভুবনে নেই। তোমাকে লোকে কখনো ভুলবে না।'

এই বলে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে যাবার জন্য ফিরলেন। তখন অগ্নি বললেন, 'মহারাজ,আমাকে বাঁচাবার জন্য তুমি নিজের গায়ের মাংস কেটে দিলে। আমি সে মাংস সোনা করে দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছি। ঐ সোনা তোমার গায়ে অতি সুন্দর রাজচিহ্ন হয়ে থাকবে। এই আশীর্বাদও করে যাচ্ছি যে কপোতরমা নামে তোমার একজন পরম ধার্মিক ছেলে হবে। তার

মতো বীর এ জগতে আর কেউ থাকবে না।' এই বলে দেবতারা বিদায় নিলেন।

বিশ্বামিত্রের তপস্যা

অতি প্রাচীনকালে কান্যকুব্জের রাজা কুশিক মহর্ষি চ্যবনের হাতে কি নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িত হয়েছিলেন সে গল্প বলা হয়েছে। ব্রহ্মা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কুশিকের ছেলে গাধি, সেই গাধির ছেলে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। চ্যবন ভেবেছিলেন কোনো সুযোগে কুশিককে নির্বংশ হবার অভিশাপ দিতে পারলেই বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ হওয়া হবে না। এ-সব ঘটেছিল বিশ্বামিত্রের জন্মের অনেক আগে। শেষ পর্যন্ত শাপ দেওয়া হয়নি, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

গাধির পর বিশ্বামিত্র রাজা হলেন। বাপ ঠাকুরদার মতো তিনিও অনেক দিন পৃথিবী জোড়া রাজ্যশাসন আর প্রজা পালন করে বহু প্রশংসা পেয়েছিলেন।

একবার তিনি এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরোলেন। দশ সেনাদলে এক অনীকিনী, আবার দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী। কাজেই সহজেই কল্পনা করা যায় বিশ্বামিত্রের দলটি নেহাত ছোট ছিল না। এদের নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিশ্বামিত্র এক সময় বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলেন।

এমন মানী-গুণী অতিথি পেয়ে বশিষ্ঠ আহ্লাদে আটখানা হয়ে রাজাকে তাঁর দরিদ্র কুটিরের সামান্য আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। রাজা তাঁকে প্রণাম করে বল্লেন, 'মহামুনি, আপনি এ-কথা বলেছেন বলেই আমি তৃপ্ত হয়েছি।' মনে মনে ভাবলেন বনবাসী মুনি এত লোকের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন কি করে করবেন। কিন্তু বশিষ্ঠ যখন বারবার পীড়া-পীড়ি করতে লাগলেন, তখন রাজি না হয়েও পারলেন না।

আসলে বশিষ্ঠের নন্দিনী বলে একটি কামধেনু ছিল। মুনি তার

কাছে যা চাইতেন তাই পেতেন। উপস্থিত সমস্যায় নন্দিনীর কাছে যেতেই সেই স্বর্গের গরু সব কথা বুঝে নিয়ে দেখতে দেখতে রাশি রাশি ক্ষীর, সর, ছানা, সন্দেশ, দই ইত্যাদি দিয়ে কুটির ভরে দিলেন। মুনির অতিথিরা তৃপ্তির সঙ্গে জলযোগ করে, তাঁর অনেক প্রশংসা করলেন।

নন্দিনী গাইটির যেমন গুণ, তেমনি রূপ। তাঁকে দেখে রাজার বড় লোভ হল। প্রবল ক্ষমতাশালী রাজা, যখনি যা ইচ্ছা হয়েছে, তাই পেয়েছেন। অতিথির কর্তব্য ভুলে তিনি গাইটিকে চেয়ে বসলেন। তার বদলে অনেক গরু আর জমি দিতে চাইলেন।

বশিষ্ঠ স্পষ্টবক্তা ছিলেন। তিনি বললেন, 'মহারাজ, আমার আশ্রমে নিত্য ধর্মকর্ম লেগে আছে। তাতে যা কিছু লাগে নন্দিনীর কাছে আমি পাই। তাকে দিলে তো আমার চলবে না।'

শখের জিনিসটি না পেয়ে রাজার চোখ লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'যদি জোর করে নিয়ে যাই, তাহলে আপনি কি করতে পারেন?'

বশিষ্ঠ মুনি বললেন, 'মহারাজ, গায়ের জোর আপনার বেশি। আমি আর কি বলব।'

রাজা তাঁর অনুচরদের হুকুম দিলেন, 'গাইটিকে বেঁধে নিয়ে চল।' কিন্তু স্বর্গের গাই অত সহজে বেঁধে নিয়ে যাওয়া যায় না। নিমেষের মধ্যে নন্দিনী দড়িদড়া ছিঁড়ে, বশিষ্ঠের কাছে ছুটে গেল। রাজপুরুষদের নিষ্ঠুর আঘাতে তার শরীর জর্জরিত, চোখে জল। তাকে দেখে বশিষ্ঠের বুক ফেটে গেল।

বশিষ্ঠ বললেন, 'মা, তোমার কষ্ট দেখে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। বিশ্বামিত্র জোর করে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, আমি তোমাকে দান করিনি।'

নন্দিনীর মুখে ভাষা এল, সে বলল, 'আপনি আমাকে ত্যাগ না করলে কারো সাধ্য নেই যে আমাকে নিয়ে যায়।'

বশিষ্ঠ বললেন, 'মা, ক্ষত্রিয়ের বল তেজ, ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা। তোমার ক্ষমতা থাকলে তুমি আমার কাছেই থাকো, কিন্তু ওরা তোমার বাছুরটিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!'

তখন রাগে নন্দিনীর শান্ত সুন্দর চেহারা বদলে গেল। সে ভয়ঙ্কর চেহারা ধরে রাজার সৈনিকদের আক্রমণ করল। তার শরীর সূর্যের মতো জ্বলতে লাগল আর তার মধ্যে থেকে ভীষণাকার সব যোদ্ধা বেরিয়ে এল, তাদের হাতে ভয়ানক সব অস্ত্র। তাদের দেখেই রাজার সেনারা যে যেদিকে পারল, পালাল। তারাও তাদের পিছনে ধেয়ে গিয়ে বহুদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে এল। কিন্তু একজনকে প্রাণে মারল না।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিশ্বামিত্র বুঝলেন যে ক্ষত্রিয়ের বলের চেয়ে ব্রাহ্মণের বল অনেক গুণ বেশি। ঋষিরা তপস্যা করে যে শক্তি ধরেন, রাজারা তাঁদের ধনজন সৈন্য নিয়ে তার কিছুই ধরেন না। বিষয়-আশয় রাজশক্তি—এসবের উপর তাঁর ঘৃণা ধরে গেল। তিনি চিরদিনের মতো ঐ-সব ছেড়ে, বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন।

সেই তপস্যা দেখে দেবতারা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। বিশ্বামিত্র একজন বিখ্যাত মুনি হয়ে উঠলেন। তা হলে হবে কি, মন থেকে তাঁর হিংসা তখনো দূর হল না। তিনি যে ভাবে পারেন বশিষ্ঠকে পীড়ন করতে লাগলেন।

সরস্বতী নদীর পূব তীরে বশিষ্ঠের আশ্রম আর পশ্চিম তীরে বিশ্বামিত্রের আশ্রম। বিশ্বামিত্র একদিন সরস্বতীকে মনে মনে স্মরণ করতেই সরস্বতী দেখা দিলেন। বিশ্বামিত্র বললেন, 'বশিষ্ঠ নদীর ধারে বসে জপ করেন। সেই সময়ে তাঁকে ভাসিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে বধ করব।'

সরস্বতী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বশিষ্ঠকে সব কথা বললেন। বশিষ্ঠ বললেন, 'বেশ তো, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল, নইলে শেষটা হয়তো তোমাকে শাপ দিয়ে বসবেন!'

এই বলে তিনি জপে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সুদ্ধ অনেক-খানি পাড় ভেঙে পড়ল আর নদীর প্রবল স্রোত মুনিকে বিশ্বামিত্রের ঘাটে পৌঁছে দিল। তাঁকে দেখে খুশি হয়ে বিশ্বামিত্র অস্ত্র আনতে গেলেন। সেই সুযোগে সরস্বতী বশিষ্ঠকে আবার ভাসিয়ে পূব তীরে নিয়ে এল। বিশ্বামিত্রের কথাও রাখা হল, আবার মুনিও বাঁচলেন।

বিশ্বামিত্র তাই দেখে মহা রেগে সরস্বতীকে শাপ দিলেন। নদীর জল রক্তবর্ণ হয়ে গেল। রাক্ষসরা ছাড়া কেউ সেই জল পান করতে পারত না। এক বছর পরে এক দল দয়ালু তপস্বী শিবের আরাধনা করবার পর সরস্বতীর জল নির্মল আর মিষ্টি হয়ে গেল।

মুনি হয়েও বিশ্বামিত্রের মনে প্রতিশোধের ইচ্ছাটা ক্রমেই বেড়েই যেতে লাগল। বশিষ্ঠের একশো ছেলে ছিল। বিশ্বামিত্রের চক্রান্তে তারা সকলেই যখন রাক্ষসের হাতে মরল, মহর্ষির বুক ভেঙে গেল। তবু তিনি বিশ্বামিত্রকে কোনো রকম শাপ দিলেন না। জীবন তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। মুনি তখন এক উঁচু পর্বতচূড়ো থেকে ঝাঁপ দিলেন।

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল না বশিষ্ঠের এভাবে মৃত্যু হয়। তাঁর শরীর পালকের মতো হাল্কা হয়ে গেল, তিনি নিরাপদে সমতল ভূমিতে নামলেন। এক বনে দাবানল জ্বলছিল, বশিষ্ঠ তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। দাবানল হিমের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নদীতে বান ডেকেছিল, বশিষ্ঠ নিজের হাত পা বেঁধে সেই ভীষণ স্রোতে ঝাঁপ দিলেন। স্রোতের ধারে তাঁর বাঁধন খসে পড়ল। তিনি অক্ষত শরীরে তীরে এসে উঠলেন। বশিষ্ঠ নদীর নাম রাখলেন বিপাশা।

এই ভাবে বশিষ্ঠ হৈমবতী নদীর তীরে এলেন। নদীতে শত শত কুমির। বশিষ্ঠ ভাবলেন, 'তাহলে আমাকে কুমিরে খাক!' কিন্তু জলের কাছে আসবামাত্র, নদীর স্রোত একশো ভাগ হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটে পালাল। বশিষ্ঠের মরা হল না। তিনি পুত্রবধূর সঙ্গে আশ্রমে ফিরে গেলেন।

তপস্যা করে বল লাভ করে বিশ্বামিত্রের অহংকার বড় বেশি বেড়ে গেছিল। তিনি এরপর একেবারে বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে দেবতাদের কাছে পাওয়া ভয়ঙ্কর সব বাণ মারতে লাগলেন। দেখতে দেখতে জ্বলে-পুড়ে আশ্রম খাক্ হয়ে গেল। ভয়ে আশ্রমবাসীরা পালাতে আরম্ভ করলেন। বশিষ্ঠ তাঁদের কত সাহস দেবার চেষ্টা করলেন, তাঁরা কান দিলেন না।

এতদিন পর বশিষ্ঠের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। তিনি যমের দণ্ডের মতো সাংঘাতিক ব্রহ্মদণ্ড হাতে নিয়ে বিশ্বামিত্রের সামনে বেরিয়ে এলেন। বিশ্বামিত্র দম্ভের সঙ্গে তাঁর সব বাছাই করা অস্ত্র ছুঁড়তে লাগলেন, ব্রহ্মদণ্ডের কাছে সব বিফল হয়ে গেল। এই প্রথম বিশ্বামিত্র দেখলেন মহর্ষি রাগলে তাঁর কি ভীষণ মূর্তি দেখা যায়। ব্রহ্মদণ্ডের মুখ দিয়ে যেমন আগুনের হল্‌কা ছুটছিল, তেমনি বশিষ্ঠের দেহের প্রত্যেক লোম-কূপ থেকেও আগুন দেখতে দেখতে বিশ্বামিত্র হেরে গেলেন। তখন আশ্রমবাসীদের কাতর মিনতি শুনে, বশিষ্ঠ আবার শান্ত হলেন।

এই শেষ বারের মতো বিশ্বামিত্রের অহংকার চূর্ণ হল। তিনি বাস্তবিকই অন্তর থেকে সব হিংসা ত্যাগ করে এমন আশ্চর্য তপস্যা করেছিলেন যে দেবতারা তাঁকে রাজর্ষি নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র আগেই রাজশক্তি পরিত্যাগ করেছিলেন রাজর্ষি নামে তাঁর কোনো লোভ ছিল না।

তিনি বনে গিয়ে বহু বছর ধরে, কি শীতে কি গ্রীষ্মে, না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে মাথা নিচের দিকে করে এমন-ই তপস্যা করলেন যে শেষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে মহর্ষি বিশ্বামিত্র হলেন। তখন আর তাঁর মধ্যে কোনো রাগ, লোভ, হিংসা, কিছু আর বাকি রইল না। তাঁর জীবনটা একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল, পবিত্র, পুণ্যময়, দয়ালু সর্বত্যাগী।

রুরুর কথা

বহুকাল আগে স্থূলকেশ নামে এক তপস্বী ছিলেন। তিনি এক দিন বন থেকে ফলমূল তুলে আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন কে যেন একটি সুন্দর ছোট্ট মেয়েকে আশ্রমে ফেলে রেখে চলে গেছে। এমন নিষ্ঠুর কাজ যে করতে পারে তার উপর মুনির যেমন রাগ হল, অসহায় শিশুটিকে দেখে তেমনি দয়াও হল। আশ্রমে উপযুক্ত কোনো মেয়ে ছিল না; মুনি নিজে ছোট মেয়েটির লালন-পালন করতে লাগলেন।

ক্রমে মেয়েটি বড় হতে লাগল। দেখতেও সে যেমন সুন্দর, তার কথাবার্তা আর ব্যবহারও তেমনি মিষ্টি। মুনি তার নাম রাখলেন প্রমদ্বরা। তার মানে সব মেয়ের মধ্যে সেরা।

মেয়েটি আরো বড় হল। এমন সময় মহর্ষি চ্যবনের নাতি প্রমতির ছেলে রুরু ঐ আশ্রমে বেড়াতে এলেন। সেখানে প্রমদ্বরাকে দেখে তাঁর এত বেশি ভালো লাগল যে মন থেকে অন্য সব চিন্তা দূর হয়ে গেল। কাজকর্মে অবহেলা, খাওয়া নেই, ঘুম নেই। ক্রমে রুরুর শরীর দুর্বল হয়ে যেতে লাগল।

তখন তাঁর বন্ধুবান্ধবরা মহাত্মা প্রমতির কাছে গিয়ে স্থূলকেশ মুনির আশ্রমে পালিতা প্রমদ্বরার কথা বলল। প্রমতি তখনি মুনির আশ্রমে গিয়ে রুরুর সঙ্গে প্রমদ্বরার বিয়ের প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাব শুনে স্থূলকেশ অতিশয় আনন্দিত হয়ে তখনি রাজি হয়ে গেলেন। রুরুর সুন্দর চেহারা, কোমল বিনয়ী ব্যবহার আর জ্ঞানবিজ্ঞা ধার্মিকতা দেখে আগেই তাকে তাঁর ভারি পছন্দ হয়েছিল।

বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেল। কয়েক সপ্তাহ পরে শুভদিন আছে, সেই দিনই বিয়ে হবে। সকলে মিলে তার আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য রকম। সকলে যখন বিয়ের চিন্তায় মশগুল, তখন এক নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গেল। প্রমদ্বরা তাঁর সখীদের সঙ্গে আশ্রমের উপবনে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় না দেখে একটা ঘুমন্ত কেউটে সাপের গায়ে তাঁর পা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে সাপ তাঁকে ছোবল মারল।

এক মুহূর্তে সব আনন্দ উপে গেল। সখীরা হাহাকার করে উঠল। মুনিরা তখুনি ছুটে এলেন ; ততক্ষণে প্রমদ্বরার দেহ বিবর্ণ হয়ে গেছে, প্রাণের সাড়া নেই। সেই অপূর্ব সুন্দর মৃতদেহের চারধারে বসে মুনিরা চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

রুরুও সেদিন আশ্রমে এসেছিলেন। এই সর্বনাশা ঘটনা দেখে পাগলের মতো তিনি বনের মধ্যে ছুটে গেলেন। গভীর বনে পৌঁছে তিনি মাটিতে আছড়ে পড়লেন। প্রথমে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

তারপরেই মনের মধ্যে কেমন একটা তেজ অনুভব করলেন।

আকাশের দিকে চেয়ে, স্বর্গের দেবতাকে ডেকে বললেন, 'যদি আমি পৃথিবীতে কোনো সৎকাজ করে থাকি, যদি আমার এ জীবনে কোনো পুণ্য সঞ্চয় হয়ে থাকে, তাহলে তার বলে আমার প্রমদ্বরা বেঁচে উঠুক!'

রুরুর অন্তরের গভীর স্থান থেকে সেই কাতর ডাক স্বর্গে গিয়ে পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক আলো করে এক জ্যোতির্ময় দেবদূত তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দেবদূত তাঁকে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'রুরু, প্রমদ্বরার আয়ু শেষ হয়েছিল, তাই তিনি মারা গিয়েছেন। মানুষ একবার মরলে আর ফিরে আসে না। তুমি যা চাইছ, তা কি করে হতে পারে?'

রুরু বললেন,'তবে কি তাকে ফিরে পাবার কোনো উপায়ই নেই?'

দেবদূত বললেন, 'তা আছে। তুমি একটি কাজ করলে, তাঁকে আবার বাঁচানো যায়।'

রুরু বললেন, 'বল কি করতে হবে। আমি এখনি করছি।'

দেবদূত বললেন, 'দেবতারা বলেছেন তুমি যদি তোমার নিজের আয়ুর আধখানা প্রমদ্বরাকে দাও, তাহলে সেই সময়টুকুর জন্য সে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে।'

রুরু আনন্দের সঙ্গে রাজি হলেন। দেবদূত যমের অনুমতি চাইলে, তিনিও বললেন, 'তবে তাই হোক।'

সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের প্রাঙ্গণে প্রমদ্বরাও চোখ রগড়িয়ে উঠে বসলেন। তাই দেখে আশ্রমবাসীরা একেবারে বাক্যহত হয়ে পড়লেন। তারপর তাঁদের আনন্দ দেখে কে!

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে উপস্থিত হল। মুনি-ঋষিদের মেয়েদের বিয়ে কখনোই রাজার মেয়েদের বিয়ের মতো জমকালো হতে পারে না। কিন্তু পবিত্রতায়, মাঙ্গল্যে, আনন্দে, প্রমদ্বরার আর রুরুর বিয়ে পৃথিবীর কোনো বিয়ের চেয়ে যে কম যায়নি। ভালভাবে শুভকর্ম শেষ হলে, রুরু তাঁর এত কষ্ট করে পাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে নিজের ঘরে

ফিরে গেলেন।

এই বিয়ের ব্যাপার কিন্তু তাঁর মনে একটা গভীর দাগা দিয়েছিল। এত সুখী হয়েও তিনি কিছুতেই সব নষ্টের গোড়া সাপের বংশকে ক্ষমা করতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল এতগুলি নির্দোষ মানুষকে যে এত দুঃখ দিতে পারে, তার বাঁচা উচিত নয়। পৃথিবীকে সর্পশূন্য করতে হবে।

এই ভেবে রুরু একটি বিশাল ডাণ্ডা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। সাপের বংশ নির্বংশ করতে হবে। সে এক অদ্ভুত অভিযান। তাঁর সামনে পড়লে কোনো সাপ প্রাণ নিয়ে পালাতে পারত না। তাঁর সামনে না পড়লেও তিনি খুঁজে খুঁজে সাপের আস্তানা বের করে, একটিকেও বাঁচতে দিতেন না। এই ভাবে কত গ্রাম, শহর, ক্ষেত-খামার, বন-জঙ্গল, পাহাড়কে যে সর্পশূন্য করলেন তাঁর হিসাব নেই।

ক্রমে তিনি সর্পকুলের বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ালেন। বিষাক্ত সাপের সঙ্গে কত নির্দোষ সাপও যে মারা পড়ল তার ঠিক কি। শেষটা এক গভীর বনে ডুণ্ডুভের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ডুণ্ডুভ এক বুড়ো সাপ। তার বিষ নেই। সে এত বুড়ো যে নড়তে চড়তে কষ্ট হয়।

রুরুর সাপ দেখলেই রাগ হত। তিনি ডাণ্ডা তুলে ডুণ্ডুভকে মারতে গেলেন। তখন ডুণ্ডুভ বলল, 'আমি তো তোমার কোনো অনিষ্ট করিনি, তবে আমাকে মারবে কেন?'

রুরু বললেন, 'একজনের দোষে তার বংশের সবাইকে শাস্তি পেতে হয়। আমার স্ত্রীকে সাপে কেটেছিল।'

ডুণ্ডুভ বলল, 'মুনিঠাকুর, তোমাকে সকলে ধর্মপরায়ণ বলে জানে। এ তোমার কেমন বিচার হল। যে সাপের বিষ নেই, কাউকে কামড়ায় না, মিছিমিছি তাকেও মারবে? তাছাড়া আমি এত বুড়ো হয়েছি যে চলতে কষ্ট হয়। তোমার মনে কি এতটুকু দয়ামায়াও নেই?'

ডুণ্ডুভের কথা শুনে রুরুর মনে হল, 'তাইতো, এ আমি কি করতে যাচ্ছি!' তিনি ডাণ্ডা নামিয়ে কোমল স্বরে বললেন, 'তুমি কে? তোমাকে তো যে-সে সাপ মনে হচ্ছে না।'

ডুণ্ডুভ বলল, 'আগের জন্মে আমি সহস্রপাদ নামে এক মুনি ছিলাম। এক ব্রাহ্মণের শাপে আমার এই অবস্থা হয়েছে। তাহলে আমার দুঃখের কথা শোন—আমার যখন অল্প বয়স, তখন খগম বলে আমার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি যপতপ নিয়ে থাকতেন, কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তবে খুব সাহসী ছিলেন না। আমি একবার মজা করবার জন্য খড় পাকিয়ে সাপের মতো বানিয়ে তাঁকে ভয় দেখিয়েছিলাম। আমি ভাবিনি তিনি এত ভয় পাবেন যে মূর্ছা যাবেন।

মূর্ছা ভাঙলে তিনি আমাকে শাপ দিয়ে বললেন—"পরজন্মে তুমি ঐ খড়ের সাপের মতোই একটা নির্বিষ নিষ্কর্মা সাপ হবে।" আমার তো চক্ষুস্থির! খগম-র মতো তেজী তাপসের কথা যে মিথ্যা হবার নয়, সেটা আমি ভালো করেই জানতাম। তাই হাত জোড় করে তাঁকে অনুনয় করতে লাগলাম—"অন্যায় করে ফেলেছি, ভাই, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। অমন শাপ দিও না।"

এক মুহূর্তে তাঁর রাগ পড়ে গেল। তিনি বললেন, "আমার মুখ দিয়ে কখনো মিথ্যা কথা বেরোয় না। পরজন্মে সাপ তুমি হবেই। কিন্তু মহর্ষি চ্যবনের নাতি প্রমতির ছেলে রুরুর সঙ্গে যেদিন তোমার দেখা হবে, সেদিন তুমি শাপ থেকে মুক্তি পাবে।"

ডুণ্ডুভের কথা শেষ হতে না হতে, তাঁর চেহারা বদলাতে আরম্ভ করল। ক্রমে তিনি মানুষের আকার ধরতে লাগলেন। তখন তিনি বললেন, 'এবার বুঝেছি তুমিই সেই প্রমতির ছেলে রুরু। আজ আমার বড় শুভদিন, তোমার দেখা পেলাম।'

রুরু চেয়ে দেখলেন অথর্ব বুড়ো সাপের জায়গায়, তাঁর সামনে অপূর্ব সুন্দর সহস্রপাদ মুনি দাঁড়িয়ে আছেন। রুরুর মন থেকে সব রাগ হিংসা বিদায় নিল। সহস্রপাদ তাঁকে অনেক সুন্দর উপদেশ দিয়ে, আশীর্বাদ করে, বিদায় নিলেন।

দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি আর দৈত্যদের গুরু শুক্রাচার্য। তিনি নাকি বিদ্যাবুদ্ধিতে বৃহস্পতিকেও ছাড়িয়ে যেতেন।

সেকালে দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের যুদ্ধ প্রায় লেগেই থাকত। অধিকাংশ সময়ে দেবতারাই জয়ী হতেন। বারবার তাঁদের কাছে পরাজিত হয়ে, দৈত্যদের শরীরও যেমন অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল, মনও তেমনি ক্রমে নৈরাশ্যে ভরে এল।

শেষটা তারা দলেবলে শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল, 'ঠাকুর! তুমি আমাদের না দেখলে, কে দেখবে? ওদিকে দেবতারা তো মেরে মেরে আমাদের বড় বড় যোদ্ধাদের প্রায় শেষ করে এনেছেন। এ ভাবে চললে আমাদের পৃথিবীতে টেকা দায় হবে। তবে কি পাতালে গিয়ে আশ্রয় খুঁজতে হবে?'

শুক্রাচার্য ছিলেন পরম জ্ঞানী। স্বয়ং ভৃগুমুনি তাঁর বাবা। তিনি শিষ্যদের সাহস দিয়ে বললেন, 'দেখ, অত ভয়ে কাতর হয়ে পড় না। যেখানে যত ভালো ভালো ওষুধ আর মন্ত্র আছে, কিছুই আমার জানতে বাকি নেই। সে সমস্ত জ্ঞান আমি তোমাদের দিচ্ছি। তাহলে দেবতারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না।'

কথাটা দেবতাদের কানেও গেল। তাঁরা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। দৈত্যরা সবাই যদি শুক্রাচার্যের সমান জ্ঞানী হয়ে ওঠে, তবেই তো সর্বনাশ! তখন আর তাঁরা ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না! কাজেই সে বিদ্যা লাভ করবার আগেই ওদের মেরে সাবাড় করা দরকার।

এ কথা যেই না ভাবা, অমনি দেবতারা তাঁদের সমস্ত বল-বিক্রম নিয়ে দৈত্যদের আক্রমণ করলেন। দৈত্যরাও বেগতিক দেখে শুক্রা-চার্যকে সামনে রেখে, তাঁর পিছনে আশ্রয় নিল। দেবতারাও তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতে ইচ্ছা করলেন না।

তখনকার মতো বিপদ কেটে গেলেও, শুক্রাচার্য শিষ্যদের ডেকে কিছু সৎ-পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, 'এক কালে দৈত্যরা স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, এই তিন লোকেই রাজত্ব করত। তারপর তাদের রাজা বলী যজ্ঞ করলেন। সেখানে বামন অবতার সেজে বিষ্ণু গিয়ে সামান্য দক্ষিণা চাইলেন। দক্ষিণাটি হল এই—তিনি তিন পদক্ষেপে যতটুকু জমি পার হতে পারেন, সেটুকু তাঁকে দেওয়া হোক।

বলী রাজা তখনি সম্মতি দিলেন আর সেই সাংঘাতিক বামন অবতার তিন পা ফেলে শুধু যে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল অধিকার করলেন তা নয়, বলী রাজাকেও বন্দী করে রাখলেন। তাছাড়া বড় বড় দৈত্য যোদ্ধারাও তাঁর হাতে মারা পড়ল।

আমার কথা মন দিয়ে শোন। এখন আর ওঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেও না। আমি মহাদেবের তপস্যা করে সঞ্জীবনী মন্ত্রটা শিখে নিই। তারপর তোমরা যত খুশি যুদ্ধ কর, কারো মারা যাবার ভয় থাকবে না।'

দৈত্যরা একথা মেনে নিল। দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ দেবতাদের বললেন, 'আমরা যুদ্ধ করা ছেড়ে দিচ্ছি। গাছের ছাল পরে, মাথায় জটা রেখে, বনে গিয়ে আমরা তপস্যা করব।'

এ-কথা শুনে দেবতারা খুবই সন্তুষ্ট হলেন। এরপর দুই পক্ষই অস্ত্র ছাড়লেন। তখনকার মতো শান্তি এল।

শুক্রাচার্য তপস্যায় যাবার আগে দৈত্যদের বললেন, 'তোমরা বরং আমার বাবা ভৃগুমুনির আশ্রমে গিয়ে সাধু সন্ন্যাসীর মতো থাক। আমিও তপস্যা শেষ করে সেখানে যাব।'

এই বলে শুক্রাচার্য এক নির্জন স্থানে দীর্ঘ দিন ধরে কঠোর তপস্যা করলেন। মহাদেব তাতে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'বর চাও।' শুক্রাচার্য বললেন, 'যে সঞ্জীবনী বিদ্যা আপনি ছাড়া কেউ জানে না, আমাকে সেই বিদ্যা শিখিয়ে দিন। আমি তার সাহায্যে দৈত্যদের রক্ষা করব।'

শিব বললেন, 'যদি তুমি এক হাজার বছর, কোনো কথা না বলে, ধোঁয়া ছাড়া কিছু না খেয়ে, আমার তপস্যা করতে পার, তাহলে আমি তোমাকে সেই বিদ্যা দান করতে পারি, নচেৎ নয়।'

শুক্রাচার্য তাতেই রাজি হয়ে, সেই কঠোর তপস্যা আরম্ভ করে দিলেন। এমন কথা কি আর চাপা থাকে। দেবতাদের কানে পৌঁছতেও খুব দেরি হল না। তাঁরা স্থির করলেন শুক্রাচার্যের তপস্যা শেষ হবার আগেই কাজ সারতে হবে।

এই মনে করে আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দৈত্যদের খোঁজে ভৃগুমুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। প্রাণভয়ে দৈত্যরা শুক্রাচার্যের মায়ের কাছে আশ্রয় নিল। সব কথা শুনে তিনি রাগে জ্বলে উঠে, দেবতাদের বললেন, তোমাদের আস্পর্ধা তো কম নয়। আমি যাদের আশ্রয় দিয়েছি. তাদের মারবার জন্যে আমার আশ্রমে এসেছ আজ ইন্দ্রকে কে বাঁচায় দেখব!'

এই বলে গুরুর মা ভীষণ রূপ ধারণ করে ইন্দ্রের দিকে তেড়ে গেলেন। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। তাই দেখে ইন্দ্রের নড়বার চড়বার ক্ষমতা রইল না আর অন্য দেবতারা যিনি যেদিকে পারলেন, পালালেন।

সেদিন ইন্দ্রের কি অবস্থা হত বলা যায় না, ভাগ্যিস বিষ্ণু এসে তাঁকে নিজের শরীরের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। তাই দেখে গুরুমাতা গর্জন করে উঠলেন, 'কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না। এখনি আমি যোগবলে দুজনকেই দগ্ধ করে ফেলব!'

বিষ্ণু আর কি করেন, নিজেদের বাঁচাবার জন্য, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুদর্শন-চক্র দিয়ে মাথা কেটে ফেললেন। এতক্ষণ ভৃগুমুনি কিছু বলেননি, এবার তিনি বিষ্ণুকে শাপ দিলেন, 'এতবড় দেবতা হয়েও তুমি স্ত্রীহত্যা করলে! এর জন্যে সাতবার তোমাকে মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে!'

তারপর স্ত্রীর কাটা মাথা তাঁর শরীরে লাগিয়ে, তার উপরে জল ছিটিয়ে বললেন, 'দেবি, তুমি জীবিত হও।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বেঁচে উঠলেন। এমন ছিল তাঁর তপস্যার বল।

এই ব্যাপারের পর ইন্দ্রকে মাথা হেঁট করে স্বর্গে ফিরে আসতে হল। সেখানে গিয়েও তাঁর মনে বড়ই দুর্ভাবনা। শেষে তাঁর মেয়ে জয়ন্তীকে ডেকে বললেন, 'শুক্রাচার্য মহাদেবের তপস্যা করে যদি একবার সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করেন, তার জোরে তাঁর শিষ্যদের কাছে শেষ পর্যন্ত আমাদের

পরাজয় স্বীকার করতে হবে। তুমি বরং তপস্যার জায়গায় গিয়ে, তাঁর সেবা করে, তাঁকে খুশি কর। যাতে তিনি আমাদের কোনো অনিষ্ট হতে না দেন।'

ইন্দ্রের আদেশে জয়ন্তী সেই দুর্গম স্থানে গেলেন গিয়ে দেখলেন না খেয়ে, কথা না বলে, শুধু ধোঁয়া পান করে, বহু বছর কেটে গেছে। শুক্রাচার্যের শরীরের এমন দুরবস্থা হয়েছে যে তিনি আচ্ছন্নের মতো মাটিতে পড়ে আছেন। মুখ দিয়ে একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে। জয়ন্তী তাঁর সেবা করতে বসে গেলেন। মাস যায়, বছর যায়, জয়ন্তীর ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই।

এই ভাবে তপস্যার এক হাজার বছর কেটে গেলে শিব শুক্রাচার্যের কাছে এসে বললেন, 'এমন কঠোর তপস্যা আর কেউ করতে পারত বলে মনে হয় না। তাও নিজের জন্য নয়, পরোপকার করবার জন্য। আমি তোমাকে এই বর দিলাম যে তোমার নিজের অসাধারণ বুদ্ধি, বল, তেজ আর তপস্যার ফল দিয়ে তুমি একাই দেবতাদের যুদ্ধে হারাতে পারবে। এর উপর তোমাকে সঞ্জীবনী মন্ত্রটিও দিলাম। এ মন্ত্র আর কেউ জানে না। এ বিদ্যা কাউকে শিখিও না।'

শিব চলে গেলে, জয়ন্তীকে দেখতে পেয়ে শুক্রাচার্য তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। তারপর বললেন, 'এতকাল ধরে আমার এমন সেবা করেছ যে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। কি চাও বল।'

জয়ন্তী মাথা নিচু করে বললেন, 'দেব, আমার মনের কথা আপনি তপস্যার বলেই জানতে পারবেন।' শুক্রাচার্য বুঝলেন জয়ন্তীর ইচ্ছা তাঁকে বিয়ে করে, দশ বছর সংসার করে। সে ইচ্ছাই পূর্ণ হল। শুক্রাচার্য তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দশ বছর সুখে কাটালেন, এই দশ বছর বাইরের লোকে তাঁকে দেখতে পেত না।

এদিকে হাজার বছর পার হয়ে গেল, শিষ্যরা বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, 'তাই তো, গুরুর কি হল? তিনি ফিরে এলেন না কেন?' তারা শুনেছিল শিবের কাছে শুক্রাচার্য বর পেয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। অথচ তাঁকে তারা কোথাও খুঁজে না পেয়ে, নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে বাধ্য হল।

সে গুজব দেবতারাও শুনেছিলেন। এখনো তাঁরা তাঁকে ক্ষমা করতে পারেননি। তখন সকলে মিলে পরামর্শ করে এক মহা অন্যায় কাজ করলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির নানা বিদ্যা জানা ছিল। তিনি শুক্রাচার্যের মতো রূপ নিয়ে, দৈত্যদের ডেকে বললেন, 'বৎসগণ, আমি সেই অমূল্য মন্ত্র শিবের কাছ থেকে পেয়েছি। এসো, তোমাদেরও শিখিয়ে দিই।'

শিষ্যরা কিছুমাত্র সন্দেহ না করে, বৃহস্পতির চারপাশে জড়ো হল। এদিকে শুক্রাচার্যের বর পাবার পর দশ বছর কেটে গেছিল, তিনি আবার নিজের চেহারা ধরে শিষ্যদের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁরি মতো দেখতে এক গুরুর সেবায় তারা রত। শুক্রাচার্যের কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। তিনি তাড়াতাড়ি দৈত্যদের ডেকে বললেন, 'শিষ্যগণ, আমিই তোমাদের গুরু শুক্রাচার্য। উনি দেবগুরু বৃহস্পতি। আমার রূপ নিয়ে তোমাদের ফাঁকি দিচ্ছেন!'

দৈত্যদের বিদ্যার দৌড় বেশি ছিল না। তারা মহা ধাঁধায় পড়ে গেল। শেষে বলল, 'তা কি করে হতে পারে? আমরা দশ বছর এঁর সেবা করছি, ইনি বৃহস্পতি হতে যাবেন কেন? তোমাকে আমরা মানি না। তুমি চলে যাও।'

যাদের জন্য হাজার বছর এত কষ্ট করেছেন, তাদের এই অকৃতজ্ঞতা দেখে শুক্রাচার্যের যেমন দুঃখ, তেমন রাগ হল। তিনি শিষ্যদের এই বলে শাপ দিলেন, 'গুরুর অপমান করেছ তোমরা, সেইজন্য দেবতাদের হাতে পরাজিত হবে।'

এ কথা শুনে বৃহস্পতির আহ্লাদ দেখে কে! এই তো তিনি চেয়েছিলেন! এখন ওদের নিজেদের গুরুর শাপেই ওরা যুদ্ধে হেরে যাবে। মাঝখান থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যাও ওদের শেখা হবে না! আর তাঁর সেখানে থাকবার কোনো দরকার ছিল না। তিনি নিজের চেহারা নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

এতক্ষণে দৈত্যদের চোখ ফুটল। সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। দুঃখে, হতাশায়, অনুতাপে তারা শুক্রাচার্যের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। তিনি ছাড়া কে তাদের রক্ষা করবে?

তাদের দুরবস্থা দেখে শুক্রাচার্যের দয়া হল।

তিনি বললেন, 'একবার তোমরা দেবতাদের কাছে পরাজিত হয়ে, পাতালে আশ্রয় নেবে। তারপর আবার ফিরে এসে জয়ী হয়ো।'

পাখিদের ইন্দ্র

কশ্যপমুনি একবার মস্ত এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। তাঁর মতো পুণ্যবান লোককে সাহায্য করতে পারলে মুনিরা, এমন কি দেবতারাও, নিজেদের ধন্য মনে করতেন। কশ্যপের যজ্ঞে তাঁরা সকলেই কাজ করতে এসেছিলেন।

সুশৃঙ্খলভাবে কিছু করতে হলে, কাজ ভাগ করে দিতে হয়। কশ্যপের যজ্ঞেও কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। যাঁরা কাঠ আনবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইন্দ্রও ছিলেন, আবার বালখিল্য মুনিরাও ছিলেন। নানা জায়গা থেকে কাঠ যোগাড় করা হচ্ছিল।

এখন বাল্যখিল্য মুনিরা মাপে নেহাৎ ছোট ছিলেন। কেউ কেউ বলেন তারা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ছিলেন, অর্থাৎ বুড়ো আঙুলটার মতো ছোট। কিন্তু সম্ভবতঃ তার চেয়েও অনেক ছোট ছিলেন। সে যাই হোক, অন্যদের কেউ কেউ বড় বড় গাছ ঘাড়ে করে যজ্ঞস্থলে আসতে লাগলেন। কিন্তু বাল্যখিল্যরা অনেকে মিলে অনেক কষ্টে একটা পাতার বোঁটা তুলে আনছিলেন।

তাতেও এমন বিশ্রী এক বাধা পড়ল যে শেষ পর্যন্ত তাঁদের আর গন্তব্যস্থানে পৌঁছনো সম্ভব হল না। কিছুক্ষণ আগে এক পাল গরু ঐ পথে গেছিল। নরম মাটিতে তাদের খুর বসে গিয়ে, গোল গোল গর্ত তৈরি হয়েছিল। তার উপর বৃষ্টি পড়াতে,ঐ সব গর্তের মধ্যে জল জমে ছিল। পাতার বোঁটা কাঁধে করে হাঁপাতে হাঁপাতে মুনিরা এগোচ্ছিলেন। পথ অতটা ঠাওর হচ্ছিল না আর পড়বি তো পড়, বোঁটাসুদ্ধ একটা গর্তে পড়ে আর উঠতে পারেন না!

সেই সময় গন্ধমাদন পর্বতের মতো কাঠের বোঝা কাঁধে নিয়ে ইন্দ্র

এসে উপস্থিত হলেন। ঐ ছোট্ট গোষ্পদে পিঁপড়ের মতো খুদে খুদে মুনিদের নাকানিচোবানি খেতে দেখে তাঁর ভারি মজা লাগল। সাহায্য করা দূরে থাকুক, খানিকটা টিটকিরি দিয়ে তিনি তাঁদের ডিঙিয়ে চলে গেলেন। বালখিল্যদের যজ্ঞে যাওয়া হল না। ইন্দ্রের ব্যবহারে তাঁরা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন।

ঐ মুনিদের শরীর ছোট হতে পারে, কিন্তু তাঁদের তেজ আর তপোবন বড় বড় ঋষিদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। এই অকারণ অপমানের শোধ নেবার জন্য তাঁরা নিজেরা এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যই ছিল এই ইন্দ্রর চেয়ে অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী আরেক ইন্দ্র জন্মাক।

বালখিল্যদের তপোবনের কথা ইন্দ্র ভালো করেই জানতেন। খেয়ালবশে একটা অন্যায় করে ফেলেছেন, এখন কি উপায় হবে? ইন্দ্রও কিছু যে-সে দেবতা ছিলেন না, তিনি কশ্যপেরই পুত্র, বারোজন আদিত্যের একজন। তাঁর আরেক নাম শক্র। কি আর করেন, গেলেন ছুটে কশ্যপের কাছে। সব কথা শুনে, কশ্যপ নিজেই বালখিল্যদের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনাদের তপস্যা বৃদ্ধি পাক। আমি একটা বিশেষ কাজে এসেছি, সেটি যেন সফল হয়, এই আশীর্বাদ করুন।'

বালখিল্যরা বললেন, 'তাই হবে।'

তখন কশ্যপ নানা মিষ্ট কথায় তাঁদের বললেন, 'ব্রহ্মা নিজেই আমার ছেলেকে ইন্দ্র করে দিয়েছেন। আপনারা যদি তার জায়গায় আরেক ইন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলে তো ব্রহ্মার কথা মিথ্যা হয়ে যায়। আপনাদের যজ্ঞ সফল হক। আরেকজন শক্তিশালী ইন্দ্র জন্মাক। কিন্তু সে এই ইন্দ্রের স্থান না নিয়ে, পাখিদের ইন্দ্র হক। আমার ছেলেকে আপনারা ক্ষমা করুন।'

বালখিল্যরা যেমন ধার্মিক, তেমনি মহৎ ছিলেন। তাঁরা তখনি ইন্দ্রকে ক্ষমা করলেন আর কশ্যপকে বললেন, 'আমাদের এই পাখির ইন্দ্রও আপনারই ছেলে হবে, মুনিবর, সে হবে দেবতাদের পরম বন্ধু।'

যথাসময়ে পাখিদের ইন্দ্র জন্মাল। তার নাম রাখা হল গরুড়। তার

মায়ের নাম বিনতা। গরুড় দেখতে ভীষণ প্রকাণ্ড। কিন্তু সে ইচ্ছামতো নিজের শরীরকে ছোট বড় করতে পারত। তার গায়ের রং ছিল টকটকে লাল। বিদ্যুতের বেগে সে উড়তে পারত, যেমন খুশি চেহারা নিতে পারত। জন্মাবামাত্র তার ফুর্তি দেখে কে! সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়ে আনন্দের চোটে বিকট চ্যাঁচাতে লাগল।

দেবতারা তাই দেখে অবাক্। ভাবলেন বুঝি আগুন। অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, 'ব্যস্ত হবার কারণ নেই, ওটা আগুন নয়, কশ্যপের ছেলে গরুড়। ও আমাদের উপকারী বন্ধু।' তখন দেবতারা গরুড়ের কাছে গিয়ে তার প্রশংসা করতে লাগলেন, শেষে বললেন, 'তোমাকে দেখে আমাদের বড় ভয় হয়েছিল। শরীরটাকে আরেকটু ছোট করলে ভালো হয়।'

গরুড় তখন নিজেকে খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে বলল, 'এই তো ছোট হয়ে গেলাম, আর ভয়ের কারণ নেই!' এই বলে সে তার মায়ের কাছে চলে গেল। এদিকে বিনতার দিন বড়ই দুঃখে কাটছিল। বাজি রেখে হেরে গিয়ে তাঁকে তখন তাঁর সতীন কদ্রুর দাসীগিরি করতে হচ্ছিল। কদ্রুও কম নিষ্ঠুর ছিলেন না। বিনতাকে দিয়ে সব রকম কষ্টকর কাজ করাতেন, তার পিঠে চেপে এখানে ওখানে যেতেন।

একদিন কদ্রু বিনতার পিঠে চড়েছেন আর তাঁর সাপ-ছেলেরা গরুড়ের পিঠে চেপেছে। এই রকম ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বিনতা গরুড়কে বললেন, 'বাছা, আমি বাজি হেরে ওদের দাসত্ব করতে বাধ্য হচ্ছি।' শুনে গরুড় ভারি দুঃখিত হয়ে সাপদের জিজ্ঞাসা করল, 'বল তো কি করলে তোমরা আমার মা-কে আর আমাকে ছেড়ে দেবে?'

সাপরা বলল, 'আমাদের জন্য অমৃত এনে দিলেই আমরা তোমাদের ছেড়ে দেব।'

গরুড় তখন বিনতাকে গিয়ে বলল, 'মা, আমি অমৃত আনতে চললাম। কিন্তু পথে কি খাব?'

বিনতা বললেন, 'সাগরে হাজার হাজার শিকারী থাকে! তাদের নিষাদ বলে তাদের ধরে খেতে পার। কিন্তু সাবধান! কখনো ব্রাহ্মণ

খেও না।'

শুনে গরুড় অবাক্। 'মা, সে কি রকম জিনিস? ভীষণ বিকট নাকি?'

বিনতা বললেন, 'যাকে খেলে পেটে ছুঁচের মতো ফুটবে, গলা আগুনের মতো জ্বলবে, জেনে রেখো সে-ই ব্রাহ্মণ।'

মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গরুড় অমৃত আনতে মাঠ বন সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চলল। বিশাল পাখা মেলে, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, এমন সময় বেজায় খিদে পেল। সে এমনি খিদে যে আর এক মুহূর্তও তর সয় না। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে এক গ্রাম। ঠিক হয়েছে, ঐ তো নিষাদের গ্রাম! এ-কথা মনে হতেই গরুড় খানিকটা নিচে নেমে, গ্রামের ঠিক উপরে পৌঁছেই বিশাল ডানা ঝাপটাতে লাগল। সে কি যে-সে ঝাপটানি তার চোটে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের মতো উঠল। শেষটা গোটা গ্রামখানাই উড়ে গিয়ে গরুড়ের বিরাট হাঁ-করা মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করে গরুড় সেটাকে গিলে ফেলল!

যেই না গেলা, পেট তো ভরলই না, তার বদলে গলা জ্বলে যায় আর কি। সর্বনাশ নিশ্চয় গ্রামের সঙ্গে ব্রাহ্মণ গিলে ফেলে থাকবে! অমনি সে কাতরভাবে ডেকে বলল, 'হেই ঠাকুর! আমি নিশ্চয় ভুল করে আপনাকে গিলে ফেলেছি! এই আমি হাঁ করলাম, আপনি দয়া করে বেরিয়ে আসুন।'

পেটের মধ্যে থেকে ব্রাহ্মণ বললেন, 'একা বেরুলে তো হবে না বাছা, সঙ্গে গিন্নি আছেন!' গরুড় ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'তাঁকে সঙ্গে করেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসুন।' আর বলতে হল না, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন আর গরুড় আবার আকাশ নিল।

মাঝপথে বাপের সঙ্গে দেখা। কশ্যপ বললেন, 'কেমন আছ, বাবা? যথেষ্ট খাবারদাবার পাচ্ছ তো?' গরুড় বলল, 'আছি ভালোই, কিন্তু যা খাবার পাই তাতে পেট তো ভরে না। কিছু খাদ্যের সন্ধান দিতে পারেন? খিদের চোটে আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে, গলা শুকিয়ে কাঠ।'

কশ্যপ বললেন, 'ঐ যে প্রকাণ্ড সরোবর দেখছো, ওর কিনারায় বিশাল এক কচ্ছপের সঙ্গে তার চেয়েও বড় এক হাতি লড়াই করছে

দেখতে পাচ্ছ? আগের জন্মে ওরা দুই ভাই ছিল। বাপ মরলে পর বিষয়-আশয় নিয়ে দুজনায় ঝগড়া হয়। তার ফলে বড় ভাই ছোটকে বলল, "পর জন্মে তুই হাতি হবি!" ছোট ভাই বলল, "তুই কচ্ছপ হবি।" তাই হয়েছে দুজনে। ঝগড়া এখনো মেটেনি। ও দুটোকে খেলে তোমারও পেট ভরবে, পৃথিবীও ঠাণ্ডা হবে! তার ওপর ভারি পুষ্টিকর খাদ্যও বটে।'

কশ্যপ চলে গেলে, ছোঁ মেরে গরুড় এক নখে হাতি, এক নখে কচ্ছপ তুলে নিয়ে ভাবতে লাগল এখন কোথায় বসে এদুটোকে খাওয়া যায়! কোথাও একটা ভালো গাছটাছও পাওয়া গেল না। যা ছিল, তার কাছে যেতেই ডানার হাওয়াতেই সব ভেঙে পড়ল। শেষে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ তার ডালে বসে ভোজন সারতে বলল। তাই শুনে গরুড় ঐ ডালে গিয়ে বসল। অমনি ডালটা মড়মড় করে উঠল। গরুড়ের তো চক্ষুস্থির! তার উপর লক্ষ্য করল যে ঐ ভাঙা ডালে সারি সারি পিঁপড়ের মতো ছোট মুনি মাথা, নিচের দিকে করে ঝুলে তপস্যা করছেন।

সর্বনাশ! এঁরা তাহলে বালখিল্য মুনি! ডালটা মাটিতে পড়লে ওঁদের নির্ঘাৎ, মৃত্যু। তখন গরুড় দুই নখে হাতি আর কচ্ছপ ঠোঁটে করে ঐ ডালটি নিয়ে একটা বসবার জায়গা খুঁজতে লাগল।

সেই সময়ে কশ্যপ গন্ধমাদন পর্বতে বসে তপস্যা করছিলেন। ছেলের অবস্থা দেখে তাকে ডেকে বললেন, 'কি সর্বনাশ, বাছা! মুনিদের অসুবিধা করলে তাঁরা যে তোমাকে শাপ দেবেন! হে মুনি ঠাকুর, আপনারা আমার ছেলেকে জলযোগ করার অনুমতি দিন। ঐ হাতি আর কচ্ছপ খেলে পৃথিবীর লোকের উপকার হবে।'

বালখিল্যরা ভারি দয়ালু ছিলেন। তাঁরা খুশি হয়েই ডাল থেকে নেমে গেলেন। গরুড়ও কশ্যপের পরামর্শে একটা বরফে ঢাকা পাহাড়ে ডালটি ফেলে দিয়ে, সেখানেই বসে এতক্ষণ পরে জলখাবার খেল।

জলখাবার খেয়ে গরুড় শরীরে নতুন বল পেল। সে আবার অমৃতের সন্ধানে আকাশে উড়ল। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে দেবতাদের কি

ভয়! ঐ বিরাট পাখিটা আবার কি চায়? সর্বজ্ঞ বৃহস্পতি বললেন, 'ও হল কশ্যপের ছেলে গরুড়। অমৃত নিতে আসছে।'

দেবতারা হাঁ হাঁ করে উঠে অমৃতের রক্ষকদের হুঁসিয়ার করে দিলেন আর নিজেরাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হলেন। যে কেউ তাঁদের দেখে ঘাবড়ে যেত। কিন্তু গরুড় কাছে এলে, তার ঐ টকটকে লাল, বিশাল বিকট চেহারা দেখে দেবতাদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে লাগলেন। ওদিকে বিশ্বকর্মা গরুড়ের সামনে পড়ে গিয়ে নাকাল হলেন। কারিগর মানুষ, যুদ্ধের তিনি কি ই বা জানেন? খানিক হাঁচড় পাঁচড় করে শেষটা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অন্য দেবতা-দেরও গরুড়ের পাখার ঝাপটানি খেয়েই অবস্থা কাহিল! যাঁরা অমৃত পাহারা দিচ্ছিলেন, পাখার হাওয়ায় ওড়া ধুলোর চোটে তাঁরাও চোখে অন্ধকার দেখছিলেন।

ভাগ্যিস সেই সময়ে পবন এসে ধূলো উড়িয়ে দিয়ে তাঁদের সকলকে খানিকটা সুস্থ করে তুললেন। এতক্ষণ পরে সাহস পেয়ে, নানান্ রকম ভীষণ শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে দেবতারা গরুড়কে আক্রমণ করলেন। কিন্তু গরুড় অনায়াসে পাখার হাওয়ায় সে-সব অস্ত্র বিফল করে দিল। তখন অমৃতের কথা ভুলে গিয়ে দেবতারা সকলে যে যেদিকে পারেন পালিয়ে গেলেন।

গরুড় অমৃতের ভাণ্ডের কাছে গিয়ে দেখল রক্ষকরা না থাকলেও পাত্রটার চারদিকে দাউদাউ করে আকাশ পর্যন্ত উঁচু আগুন জ্বলছে। গরুড় তখন এক বুদ্ধি করল। সে তো চেহারা বদলাবার বিদ্যা জানত। অতি সহজেই তার একটা মাথা এক হাজার একশো মাথা হয়ে গেল। তখন সেই এক হাজার একশো মুখ ভরে জল এনে গরুড় আগুনের উপরে কুলকুচি করল। আগুন নিবল।

তখন দেখা গেল আরো বাধা আছে। একটা ভীষণ ধারালো চাকা অমৃতের পাত্রের উপর ঘুরছে। কাছে গেলেই কাটা পড়ার ভয় আছে। কিন্তু চাকার ঠিক মধ্যিখানে ছোট্ট একটা ছ্যাঁদা ছিল। সেটা গরুড়ের চোখে পড়তেই, সে মৌমাছির মতো ছোট হয়ে, তার ভিতর দিয়ে গলে

গেল।

ঐখানেই শেষ নয়। চাকার নিচে দুটো ভয়ংকর সাপ চোখ দিয়ে আগুন আর মুখ দিয়ে ক্রমাগত বিষ ঝরাচ্ছিল। ঐ সর্বনাশ সাপ কারো দিকে তাকালেই সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। গরুড় তাদের তাকাবার সময় দিল না। পাখার হাওয়ায় ধুলো উড়িয়ে বেচারাদের চোখ অন্ধ করে দিল। সাপের চোখে পলক পড়ে না, তারা ধুলো থেকে চোখ বাঁচাবে কি করে? গরুড় সেই সুযোগে নখ দিয়ে সাপ দুটোকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলল।

তারপর অমৃতের পাত্রটি তুলে নিয়ে সাঁই-সাঁই করে আবার উড়ে চলল। মাঝপথে বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা। বিষ্ণু বললেন, 'তোমার বীরত্বে আমি বড়ই খুশি হয়েছি। বর চাও।'

গরুড় বলল, 'তাহলে আমাকে অমর করে দাও আর তোমার চেয়েও উঁচুতে বসবার জায়গা দাও।'

বিষ্ণু বললেন, 'বেশ, তাই হবে।'

তখন গরুড় বলল, 'আমারও তোমাকে বড় ভালো লেগেছে। তুমিও বর চাও।'

বিষ্ণু বললেন, 'তাহলে তুমি আমার বাহন হও। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? তোমাকে যে আমার চেয়ে উঁচুতে রাখতে হবে। তুমি বরং আমার রথের চূড়োয় বস আর সবাইকে বল যে তুমি আমার বাহন। তাহলেই হবে।'

গরুড়-ও তাতে রাজি।

তারপর আবার যেই সে অমৃত নিয়ে রওনা হয়েছে, অমনি ইন্দ্র তার দিকে বজ্র ছুঁড়ে মারলেন। বজ্র বিফল হল। কিন্তু গরুড়ের মনে হল দধীচের হাড়ে তৈরি যে বজ্র, সে বিফল হলেও, তার মান রাখা উচিত। এই ভেবে সে একটা লাল পালক খসিয়ে, ইন্দ্রকে বলল, 'এই দেখুন, আপনার অস্ত্রের সম্মান রাখলাম।'

ইন্দ্রের সব রাগ জল হয়ে গেল। গরুড়ও মন থেকে শত্রুভাব মুছে ফেলল। দুজনায় বন্ধুত্ব হল। তখন ইন্দ্র বললেন, দেখ ভাই, যে-ই

অমৃত পান করবে সে-ই অমর হয়ে যাবে। তাকে আর বাধা দেওয়া যাবে না, সে ইচ্ছামতো দেবতাদের উপর অত্যাচার করবে, এটা তো বুঝতে পারছ? তোমার নিজের জন্য অমৃতের দরকার নেই, তুমি এমনিই অমর, তাহলে ওটা নিয়ে যাচ্ছ কেন? আমাকে দিয়ে যাও।'

গরুড় তখন বলল, 'বিশেষ দরকার না থাকলে নিয়ে যেতাম না। কিন্তু সাপরা আমার মা বিনতাকে বড়ই কষ্ট দিচ্ছে। তারা বলেছে অমৃত এনে দিলে তারা দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দেবে। তাই নিয়ে যাচ্ছি। আপনি আমাকে এই বর দিন যে এখন থেকে সাপরা আমার খাদ্য হবে এবং তাদের বিষে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। তাহলে আমি ওদের সামনে অমৃত নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পাত্রটি তুলে নিয়ে আসতে পারবেন।'

ইন্দ্র বললেন, 'বেশ, তবে তাই হবে।'

ইন্দ্র বিদায় নিলে গরুড় অমৃত নিয়ে এগিয়ে চলল। দেখতে দেখতে সাপদের কাছে পৌঁছে গিয়ে, গরুড় বলল, 'এই দেখ, তোমাদের জন্য অমৃত এনে এই কুশাসনটির উপরে রাখলাম। তোমরা স্নান করে শুদ্ধ হয়ে এসে অমৃত পান কর। আর দেখ, আমিও যেমন আমার কথা রাখলাম তেমনি তোমাদের কথামতো এই মুহূর্ত থেকেই মা আর আমি তোমাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হলাম।'

এই বলে গরুড় সেখান থেকে চলে গেল। সাপরাও স্নান করতে গেল। আর সেই সুযোগে ইন্দ্রও চটপট অমৃত নিয়ে প্রস্থান করলেন। সাপরা ফিরে এসে দেখে কুশাসন আছে, কিন্তু অমৃতের পাত্রটি নেই! তখন তারা বৃথা আক্ষেপ করে সময় না কাটিয়ে বলাবলি করতে লাগল, 'বিনতাকে আমরা চালাকি করে বাজিতে হারিয়েছিলাম, তাতে আমাদের পাপ হয়েছিল। এই তার শাস্তি। আহা, এইখানে গরুড় অমৃত রেখে গেছিল গো!' এই বলে তারা আসনটাকে চাটতে লাগল। কুশ বড় ধারালো হয়। চাটতে গিয়ে সাপদের জিব চিরে গেল। আজ পর্যন্ত ওদের চেরা জিব দেখা যায়।

গরুড় আর বিনতা আবার স্বাধীন হল। ইন্দ্রের কথামতো সেদিন

থেকে সাপ হল গরুড়ের খাদ্য। সাপের বিষে তার কোনো ক্ষতিও হত না, তাছাড়া পৃথিবীতে এত সাপ যে আর তার কখনো খাদ্যের অভাব হয়নি। এদিকে পৃথিবীর মানুষরাও সাপের বংশ ধ্বংস হচ্ছে দেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

বৃহৎকথার গল্প

বহুকাল আগে শিব পার্বতী যখন কৈলাস পাহাড়ে ছিলেন, তখন শিব পার্বতীকে এক চমৎকার নতুন গল্প বলেছিলেন। শিবের ইচ্ছা ছিল না এ গল্প আর কেউ শোনে। তাই তিনি ঘরের দরজাটা বন্ধ করে বাইরে নন্দীকে পাহারা বসিয়ে রেখেছিলেন। তাকে আদেশ করেছিলেন গল্প শেষ না হওয়া অবধি কাউকে যেন ঘরে ঢুকতে না দেওয়া হয়।

কিছুক্ষণ পরে শিবের প্রধান অনুচর পুষ্পদন্ত এসে ভিতরে ঢুকতে চাইলেন। নন্দী বাধা দিয়ে বলল, 'এখন ঘরে যাওয়া বারণ। মহাদেব দেবীকে গল্প শোনাচ্ছেন।' এ-কথা শুনে পুষ্পদন্তের বড়ই কৌতূহল হল। তাঁর নানা রকম বিদ্যা জানা ছিল। তার সাহায্যে তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ঐ ঘরে ঢুকলেন। নন্দী কিছু টের পেল না।

সেদিন শিব পার্বতীকে বিদ্যাধরদের সম্বন্ধে সাতটি গল্প শুনিয়েছিলেন। পুষ্পদন্ত সব শুনেছিলেন, আর শুধু তাই নয়, বাড়ি গিয়ে তাঁর স্ত্রী জয়াকে সে গল্প বলে চমৎকৃত করেছিলেন। গল্পগুলি বললেও, ওগুলি তিনি কোথায় এবং কি ভাবে শুনেছিলেন, সে-কথা পুষ্পদন্ত জয়ার কাছে প্রকাশ করেননি।

এদিকে জয়া ছিলেন পার্বতীর প্রিয় সখী, তিনিও এমন আশ্চর্য গল্প দেবীকে না বলে পারলেন না। জয়ার মুখে একই গল্প শুনে পার্বতী আশ্চর্য হলেন, কারণ শিব বলেছিলেন এ গল্প পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। মহাদেবকে সে কথা বলাতে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। দেবীকে বললেন, 'ও হল একেবারে আনকোরা নতুন গল্প, কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। পুষ্পদন্ত নিশ্চয় অদৃশ্য ভাবে ঘরে

ঢুকে ঐ গল্প শুনেছিল। তারপর বাড়ি গিয়ে জয়াকে বলেছিল।'

এ-কথা শুনে পার্বতী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, পুষ্পদন্তকে এই বলে শাপ দিলেন, 'তুমি শিবের আদেশ অমান্য করে, ঘরে ঢুকে গল্প শুনেছিলে। তাই তোমাকে মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে।'

পুষ্পদন্তের বন্ধু শিবের আরেক অনুচরের নাম মাল্যবান। তিনি পুষ্পদন্তের হয়ে বলতে গিয়ে, নিজেও দেবীর কোপে পড়লেন। দেবী বললেন, 'তুমিও পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্ম নেবে।'

এমন সাংঘাতিক শাপের কথা শুনে দুই অনুচর দেবীর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত দেবী বললেন, 'একবার যা বলেছি তা মিথ্যা হবার নয়। তোমরা মানুষ হয়ে জন্মাবে, কিন্তু মানবজন্ম থেকে উদ্ধার পাবার উপায় আছে।

বিন্ধ্যবনে কর্ণভূতি নামে এক পিশাচ বাস করে। সে আগে সুপ্রতিক বলে একজন যক্ষ ছিল। কুবেরের শাপে পিশাচ হয়েছে। তাকে দেখলেই পুষ্পদন্তের এ-জন্মের সব কথা মনে পড়ে যাবে। তখন কর্ণভূতিকে এই গল্প শোনালে পুষ্পদন্তের মুক্তি হবে। আবার কর্ণভূতিও মাল্যবানকে ঐ গল্প বলবে। মাল্যবান গল্পটি জগতে প্রচার করলে তার ও মুক্তি হবে। আর গল্প শেষ হলেই কর্ণভূতিও আবার যক্ষ হয়ে যাবে '

পার্বতীর কথা মিথ্যা হবার নয়। এর কিছুদিন পরে দুজনেই মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন। পুষ্পদন্ত কৌশাম্বী নগরে জন্মালে, তার নাম হল বররুচি। ক্রমে তিনি বড় হলেন, লেখাপড়া শিখলেন, তারপর মগধের রাজা নন্দের মন্ত্রী হলেন।

ওদিকে মাল্যবান সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে গুণাঢ্য নামে জন্মালেন। বররুচি একদিন বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে পূজা দেবেন বলে বিন্ধ্যবনে গেলেন। সেখানে দেবী স্বপ্নে তাঁকে বললেন, 'এই বনে কর্ণভূতি নামে এক পিশাচ থাকে। তার সঙ্গে দেখা কর।' পরদিন বররুচি বিন্ধ্যবনে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত কর্ণভূতিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেন পিশাচ হয়েছ?'

কর্ণভূতি বলল, দুঃখের কথা আর কি বলব। আগের জন্মে আমি কুবেরের অনুচর ছিলাম। কিন্তু স্থূলশিরা বলে এক রাক্ষসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাই দেখে কুবের আমাকে শাপ দিয়েছিলেন, 'যেমন যক্ষ হয়েও রাক্ষসের সঙ্গে ভাব করেছি, তেমনি পিশাচ হয়ে বিন্ধ্যবনে আমাকে থাকতে হবে। তবে শিবের অনুচর পুষ্পদন্ত পার্বতীর শাপে মানুষ হয়ে যখন তোমাকে এক আশ্চর্য গল্প শোনাবেন আর তুমি সে গল্প সুপ্রতিষ্ঠিত নগরের গুণাঢ্যকে বলবে, তখনি তোমার মুক্তি হবে।'

কর্ণভূতির কথা শোনামাত্র বররুচির পূর্বজন্মের সব কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, 'আমিই সেই পুষ্পদন্ত। তাহলে গল্প শোন।' এই বলে তাকে সাত লক্ষ শ্লোকের সেই আশ্চর্য গল্প শোনালেন। গল্প শেষ হলে বললেন, 'তুমি এখানে থাক, গুণাঢ্যরূপী মাল্যবান-ও এখানেই আসবেন। তুমি তাঁকে গল্প শুনিয়ে মুক্ত হয়ো।'

এই বলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে বররুচি প্রাণ দিলেন আর আবার পুষ্পদন্ত রূপে কৈলাসে চলে গেলেন।

ততদিনে মাল্যবান সুপ্রতিষ্ঠিত নগরের রাজা সাতবাহনের মন্ত্রী হয়েছেন। সকলে তাঁকে গুণাঢ্য বলে জানে। ভ্রমণ করতে করতে তিনিও একদিন বিন্ধ্যবনে এসে পৌঁছলেন। তাঁকেও দেবী স্বপ্নে কর্ণভূতির কাছে গিয়ে বররুচির বলা সেই গল্প শুনতে বললেন।

গুণাঢ্য কর্ণভূতিকে খুঁজে বের করে গল্প শুনতে চাইলেন। কথা বললেন পিশাচ ভাষায়। তাঁর মুখে ঐ ভাষা শুনে কর্ণভূতি অবাক হয়ে গেল। তখন গুণাঢ্য তাকে এক চমৎকার কাহিনী শোনালেন। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন, আমি রাজা সাতবাহনের মন্ত্রী। প্রবল প্রতাপশালী হলেও রাজা ছিলেন মুখ্যু। সংস্কৃত জানতেন না।

একদিন পুকুরের জলে স্নান করতে গিয়ে তিনি রাণীর গায়ে জল ছিটিয়েছিলেন। তাতে রাণী বলেছিলেন মোদকৈঃ পরিতাড়য়', অর্থাৎ আমার গায়ে জল ছিটিও না। রাজার শুধু মোদক কথাটাই চেনা ঠেকল। মোদক মানে লাড্ডু। তিনি রাণীর জন্য উৎকৃষ্ট মোদক আনিয়ে দিলেন। তাই দেখে রাণী তাঁকে ব্যঙ্গ করে বললেন, 'মোদকৈঃ মানে বুঝলে

না? মা উদকৈঃ সন্ধি করে হল মোদকৈঃ, অর্থাৎ জল ছিটিও না। তুমি দেখছি আকাট মুখ্যু।'

লজ্জায় অপমানে রাজা খাওয়াদাওয়া দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করলেন। তখন তাঁর দুই মন্ত্রী গুণাঢ্য আর সর্ববর্মা কারণ জানতে গেলেন। কিন্তু রাজা কোনো কথাই বললেন না। সর্ববর্মা ভারি চতুর, তিনি তখন বললেন, 'মহারাজ, কাল আমি স্বপ্ন দেখেছি সরস্বতীদেবী আপনার মুখে প্রবেশ করেছেন।' এতক্ষণ পরে রাজা মুখ খুললেন। তিনি বললেন, 'আমাকে সংস্কৃত শিখতেই হবে। কতদিন লাগবে?' গুণাঢ্য বললেন, 'সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখতে সাধারণতঃ বারো বছর লাগে। কিন্তু আমি ছয় বছরে শেখাব।'

তাতে সর্ববর্মা বললেন, 'রাজার সুখের শরীর, অতদিন খাটতে পারবেন না। আমি ছয় মাসে শেখাব।' এ-কথা শুনে গুণাঢ্যের বড় রাগ হল। তিনি বললেন, 'তা যদি পার, তাহলে আমি চলিত সংস্কৃতে, প্রাকৃত আর দেব-ভাষা তিনটেই ছেড়ে দেব।'

সর্ববর্মাও গুম হয়ে উঠে বললেন, 'আর যদি না পারি, তাহলে আমি তোমার পাদুকাজোড়া বারো বছর মাথায় নিয়ে ঘুরব।'

এই বলে সর্ববর্মা বনে গিয়ে কার্তিকের তপস্যা করতে লাগলেন। কার্তিক খুশি হয়ে তাঁকে বললেন, 'আমি তোমাকে "কলাপ" বলে নতুন ব্যাকরণের নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি তার সাহায্যে রাজাকে ছয় মাসে সংস্কৃত শেখাতে পারবে।'

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি সর্ববর্মা রাজাকে ছয় মাসে সংস্কৃত শেখালেন আর গুণাঢ্য বাধ্য হয়ে তাঁর জানা ভাষা তিনটি ছেড়ে, মৌনী হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারপর একসময় বিন্ধ্যবনে এসে দেবীর আদেশ পেয়ে কর্ণভূতিকে খুঁজতে বেরোলেন। ঐ বনে অনেক পিশাচের বাস ছিল। তাদের কথা শুনে শুনে গুণাঢ্য অল্প দিনেই পিশাচ ভাষা শিখে ফেললেন আর সেই ভাষাতেই এখন তিনি কর্ণভূতির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

কর্ণভূতিও সব কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে পিশাচ ভাষায় তাঁকে মহাদেবের

সেই সাতটি গল্প বলল। সেই গল্পগুলি সাত লক্ষ শ্লোকে শেষ করতে গুণাঢ্যের সাত বছর লেগেছিল।

বনের মধ্যে সাত লক্ষ শ্লোক লেখার কালি কোথায় পাবেন। শোনা যায় নিজের শিরার রক্ত দিয়ে ঐ গল্প লেখা হয়েছিল। তার নাম হয়েছিল বৃহৎকথা। বই তো লেখা হল। লেখা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণভূতি পিশাচ জন্ম থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ঐ গল্প প্রচার না করা অবধি গুণাঢ্যের উদ্ধার নেই। এখন কি করে একাজ সম্ভব হয়?

অনেক ভেবেচিন্তে গুণাঢ্য তাঁর এত কষ্টে লেখা সাত লক্ষ শ্লোক শিষ্যের হাতে রাজা সাতবাহনকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে প্রার্থনা করলেন রাজা যেন গল্পগুলি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। রাজা না করলে কে-ই বা করবে? তাছাড়া পুরনো প্রভুও বটে।

কিন্তু কথায় বলে রাজা-রাজড়ায় কখনো বিশ্বাস রাখতে নেই। সর্ববর্মার শিক্ষায় জ্ঞানলাভ করেও রাজার চৈতন্য হয়নি। তিনি বললেন, 'পিশাচ ভাষায় লেখা সাত লক্ষ নীরস শ্লোক, ও দিয়ে আমি কি করব?'

শিষ্যের কাছে কথা শুনে হতাশায়, গুণাঢ্য ভেঙে পড়লেন। বনের মধ্যে আগুনের কুণ্ড জ্বেলে, একেক পৃষ্ঠা বনের পশুপাখিদের পড়ে শোনান আর পাতাটি আগুনে ফেলে দেন। পশুপাখিরাও মুগ্ধ হয়ে শ্লোক শোনে, খাওয়া দাওয়া ভুলে যায়। এই ভাবে ছয় লক্ষ শ্লোক পোড়ানো হলে পর শিষ্যরা শেষ এক লক্ষ শ্লোক পোড়াতে দিল না। সেই শ্লোকে নরবাহনদত্তের কাহিনী লেখা ছিল। এখন শুধু সেটিই জানা যায়, বাকি সব লেখক নিজেই মনের দুঃখে নষ্ট করে ফেলেছিলেন।

এদিকে সাতবাহনের শরীর ক্রমে অসুস্থ হতে লাগল। রাজবৈদ্য বললেন, 'শুকনো মাংস খেয়ে এই রোগ হয়েছে।' রান্নাঘরের পাচকরা বলল, 'শিকারীরা এই রকম মাংসই দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কোনো দোষ নেই।' শিকারীদের ধরে এনে জিজ্ঞাসা করাতে তারা বলল, 'দোহাই মহারাজ, আমাদের অপরাধী করবেন না। বিন্ধ্যবনে আমরা শিকার করি। কিছু দিন থেকে সেখানে এক ব্রাহ্মণ এসে কুণ্ড জ্বেলে,

পশুপাখিদের ডেকে অতি অদ্ভুত গল্প বলেন আর তারাও খাওয়া-দাওয়া ভুলে তাই শোনে। সেইজন্য তাদের গায়ের মাংসের এই অবস্থা।'

এমন অদ্ভুত কথা শুনে রাজা আর থাকতে পারলেন না। শিকারীদের সঙ্গে নিজেই বনে গেলেন। গিয়ে দেখলেন শিকারীরা যা বলেছিল ঠিক তাই। সেই ব্রাহ্মণকে দেখে তিনি চিনতেও পারলেন। এ যে তাঁর সেই নিখোঁজ মন্ত্রী গুণাঢ্য। রাজা তাঁকে ফিরে পেয়ে বড় আনন্দিত হলেন। তখন গুণাঢ্য তাকে সেই কৈলাস পাহাড়ে শাপগ্রস্ত হওয়া থেকে সব কথা বললেন।

তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে রাজার মন অনুতাপে ভরে গেল। ছয় লক্ষ শ্লোক নষ্ট হয়ে গেছে, শিষ্যেরা শেষ এক লক্ষ শ্লোক রাজাকে এনে দিল। গুণাঢ্য বললেন, 'এগুলি পিশাচ ভাষায় লেখা, কিন্তু গুণদেব আর নন্দীদেব, এই আমার শিষ্য তার মানে বুঝিয়ে দেবে। আপনি দয়া করে এগুলি প্রচার করবেন।'

এই বলে গুণাঢ্য যোগবলে তখনি শাপমুক্ত হয়ে চলে গেলেন।

তারপর রাজা সাতবাহন,গুণদেব আর নন্দীদেবের সাহায্যে ঐ এক লক্ষ শ্লোক জগতে প্রচার করলেন। সেই শ্লোকগুলিতে নরবাহনদত্তের কাহিনীর বর্ণনা আছে। পরে সোমদেব ভট্ট গল্পটিকে সংক্ষেপ করে লেখেন। তার-ই নাম কথাসরিৎসাগর। বাকি ছয় লক্ষ শ্লোকে লেখা ছয়টি গল্পের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

নল ও দময়ন্তী

সেকালে বিদর্ভদেশে ভীম নামে এক পরম গুণী রাজা ছিলেন। মহামুনি দমনের আশীর্বাদে তাঁর তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েছিল। মুনির নামে রাজা তাদের নাম রেখেছিলেন দম, দান্ত, দমন। মেয়ের নাম হল দময়ন্তী। রূপে গুণে জগতে তাঁদের তুলনা ছিল না। স্বর্গ থেকে দেবতারা পর্যন্ত তাঁদের প্রশংসা করতেন।

এই সুন্দর ছেলেরা আর তাঁদের বোন দময়ন্তী আদর যত্নে আর

সব রকম সৎ শিক্ষায় ক্রমে বড় হয়ে উঠলেন। দময়ন্তী যেখানে যেতেন চারদিক আলো হয়ে উঠত, রাজ্যের লোক অবাক হয়ে তাঁকে দেখত আর শত শত আশীর্বাদ করত।

এই ভাবে দময়ন্তীর বিয়ের বয়স হয়ে উঠল। এমন সময় একদিন রাজবাড়ির মাঝখানে অন্দরের ফুলবাগানে সখীদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে, তিনি এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন। এক ঝাঁক হাঁস এসে বাগানে নেমেছে! তাদের সর্বাঙ্গ সোনার তৈরি; অপূর্ব ভঙ্গীতে তারা খেলা করে বেড়াচ্ছে!

রাজকুমারী সখীদের নিয়ে ঐ হাঁস ধরবার জন্য ছুটলেন। কিন্তু সহজে তারা ধরা দেয়! একটা হাঁস কেমন করে দল-ছাড়া হয়ে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল, দময়ন্তী তাকেই ধরতে গেলেন।

তখন ঐ হাঁস মানুষের মতো কথা বলল, 'রাজকন্যে, রাজা নলের নাম শুনেছ? একমাত্র তিনিই তোমার স্বামী হবার যোগ্য।'

শুনে দময়ন্তী অবাক হলেন। এ কেমন মায়া-পাখি যে কথা বলে! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কথা-বলা পাখি, তুমিও যেমন আশ্চর্য, তোমার কথাও তেমনি আশ্চর্য। কে এই রাজা নল?"

পাখি বুঝিয়ে বলল, 'দূরে নিষেধ বলে একটা দেশ আছে। নল সেখানকার রাজা। রূপে গুণে তিনি দেবতাদের হার মানান। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হলে, তুমি বড়ই সুখী হবে।'

দময়ন্তী বললেন, 'তাহলে তাকেও এমন কথাটি জানিয়ে এসো না কেন।'

তখন মানুষের মতো হাসতে হাসতে হাঁসরা নল রাজার দেশে উড়ে গেল।

আসলে তারা তাঁর কাছ থেকেই এসেছিল। সকলের কাছে দময়ন্তীর রূপ গুণের কথা শুনে মনে মনে নলের তাঁকে বড়ই ভালো লেগেছিল। এ-সব ঘটনার আগে এক দিন নিজের প্রাসাদের বাগানে বসে নল দময়ন্তীর কথাই ভাবছিলেন, এমন সময় এক ঝাঁক সোনার হাঁস তাঁর বাগানে নেমে খেলা করতে লাগল। নল তাদের একটিকে

ধরে ফেলতেই, সে বলল, 'আমাকে যদি মুক্তি দেন, আমি আপনাকে দময়ন্তীর সংবাদ এনে দেব।'

বলামাত্র নল তাকে ছেড়ে দিলেন। ঐ হাঁসই দময়ন্তীর সঙ্গে কথা বলে গেল। হাঁসের কথা শুনে অবধি নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দময়ন্তী সব সময় শুধু নলের কথাই ভাবেন। শরীর রোগা হয়ে যেতে লাগল। তাই দেখে তাঁর মা-বাবা স্থির করলেন একটা স্বয়ম্বর সভা ডাকতে হবে। দময়ন্তী তার পছন্দমতো স্বামী বেছে নেবেন। তাহলেই তিনি সুখী হবেন।

যেমন কথা, তেমনি কাজ। দেশ-বিদেশে দূতেরা খবর নিয়ে গেল, পৃথিবীর সমস্ত রাজা আর রাজকুমারের মধ্যে থেকে দময়ন্তী নিজের স্বামী নির্বাচন করবেন। রাজকুমারীর রূপগুণের খ্যাতি কারো অজানা ছিল না। দলে দলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা আর রাজকুমাররা বিদর্ভ দেশের দিকে রওনা হলেন আর শুধু পৃথিবীর রাজারা কেন, দেবতারাও বাদ গেলেন না।

তার একটা মজার কারণও ছিল। পৃথিবীর রাজারা সব সময় পরস্পরের শত্রুতা করতেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। তার ফলে হাজার হাজার লোক মারা যেত এবং দলে দলে সবাই স্বর্গে গিয়ে হাজির হত, কারণ দেশপ্রেমের জন্য যারা যুদ্ধে মরে, তারা সবাই স্বর্গে যায়।

হঠাৎ এই দলে দলে লোক আসা বন্ধ হল। দেবতারা তো অবাক! এর কারণটা কি? তখন নারদ মুনি বুঝিয়ে বললেন, 'আহা, পৃথিবীর রাজারা সবাই যে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় যাবার তোড়জোর করছে। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া বা যুদ্ধ করার তাদের সময় কোথায়? যুদ্ধও হচ্ছে না, লোক ও মরছে না। এই হল সহজ ব্যাপার।'

এ-কথা শুনে দেবতাদের বড়ই কৌতূহল হল। 'তাই নাকি? তাহলে তো একবার গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসতে হবে। আর তেমন অদ্বিতীয়া রাজকুমারী হলে, আমরাই বা প্রতিযোগিতায় নামব না কেন?'

এই বলে খানিকটা মজা করে, খানিকটা কৌতূহলী হয়ে ইন্দ্র, অগ্নি, যম আর বরুণ যে যার বাহনে চেপে বিদর্ভ অভিমুখে রওনা দিলেন। তাঁরা যতই বিদর্ভের দিকে এগোন, পথের ভিড় ততই বাড়ে।

এখন ঐ ভিড়ের মধ্যে রাজা নলও ছিলেন। সকলের মাঝখানে তাঁর সেই অপূর্ব চেহারা দেখে তাঁকে চিনে নিতে দেবতাদের কোনোই অসুবিধা হল না। এমন রূপ দেবতাদেরও হার মানায়। এতো মহা গেরো! শেষটা কি দেবতা হয়ে তাঁরা একটা সামান্য মানুষের কাছে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হবেন! ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করেই হোক, লোকটাকে পথ থেকে সরাতে হবে। তাঁরা ঠিক করলেন একটু চালাকি করেই কাজ হাসিল করতে হবে।

এই ভেবে নলের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমরা চার দেবতা স্বর্গ থেকে এসেছি। আমাদের জন্য তোমাকে একটা কাজ করে দিতে অনুরোধ করছি।' নল বললেন, 'যে আজ্ঞা।' দেবতারা তখন বললেন, 'তোমাকে তো আমরা ধার্মিক বলেই জানি, তুমি বাপু আমাদের দূত হয়ে, আগের থেকেই দময়ন্তীর কাছে গিয়ে, আমাদের পক্ষ নিয়ে এই কথা বল যে তিনি যেন আমাদের মধ্যেই একজনের গলায় মালা দেন।'

একথা শুনে নলের বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু দেবতাদের কথা অমান্য করার সাধ্য তাঁর ছিল না। বিশেষ করে যখন 'যে আজ্ঞা' কথাটি উচ্চারণ করেছেন। খালি বললেন, 'প্রহরীরা আমাকে রাজকুমারীর কাছে যেতে দেবে কেন?' দেবতারা বললেন, 'আমাদের বরে তারা কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। তবে রাজকুমারী আর তার সখীরা দেখতে পাবেন।'

ঠিক তাই হল। নির্বিঘ্নে নল দময়ন্তীর সামনে পৌঁছলেন। সখীরা তাঁকে দেবতা ভাবলেন। কিন্তু দময়ন্তী তাঁকে দেখবামাত্র চিনতে পারলেন। নল তাঁকে দেবতাদের অনুরোধের কথা জানাতেই, দময়ন্তী বললেন,'হাঁসের মুখে যে মুহূর্তে তোমার কথা শুনেছিলাম, তখন থেকেই জানি তোমাকে ছাড়া আর কাকেও আমি বিবাহ করতে পারব না। তুমি আমাকে ত্যাগ করলে, আমি বিষ খেয়ে মরব।'

নল মহা সমস্যায় পড়লেন। বিনীত ভাবে বললেন, 'স্বর্গের দেবতারা তোমাকে বিয়ে করতে চাইছেন, তবু তুমি কেন আমার মতো সামান্য মানুষকে পছন্দ করেছ?'

দময়ন্তী কাঁদতে লাগলেন, দেবতাদের আমি শ্রদ্ধা ভক্তি করি, কিন্তু তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারব না। তুমি আমার কাছে দেবতাদের ইচ্ছার কথা জানিয়েছ, তবু যদি আমি সকলের সামনে তোমারি গলায় মালা দিই, তাতে তোমার কোনো পাপ হবে না।

দেবতাদের কাছে ফিরে এসে, সত্যবাদী নল সব কথাই জানালেন। তাঁরা কোনো কথাই বললেন না। দেখতে দেখতে স্বয়ম্বরের দিন এসে গেল। নিখুঁত ব্যবস্থা। চমৎকার করে সাজানো সভাঘরে, সোনার সিংহাসনে সারি সারি সুসজ্জিত, সুদর্শন, নানা গুণে-গুণী রাজারা রাজপুত্ররা আসন নিয়েছেন। ঘটকরা মালা চন্দন পরে, একে একে তাঁদের পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু দময়ন্তীর কোনো দৃষ্টি নেই, তাঁর চোখ দুটি নলকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ তিনি আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন অবিকল নলের মতো দেখতে পাঁচজন অপরূপ সুন্দর পুরুষ পাশাপাশি বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে কে যে সত্যিকার মানুষ নল তা বোঝা দায়। কিন্তু ভালোবাসার চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড়ই কঠিন। দু-চোখ ভরে দেখতে দেখতে, দময়ন্তী লক্ষ্য করলেন একজন নলই সিংহাসনে স্বাভাবিক ভাবে বসে আছেন। বাকিরা আসন থেকে সামান্য উঁচুতে শূন্যে বসেছেন। তখন কে যে মানুষ আর কারা দেবতা বুঝতে দময়ন্তীর কোনো অসুবিধাই হল না। তিনি লজ্জায় মাথা নিচু করে, আনন্দের সঙ্গে মানুষ নলের গলায় মালা দিলেন।

অন্য রাজা-রাজড়ারা আক্ষেপ করতে লাগলেন এত চেষ্টা করেও কিছু হল না। নলের উপর যথেষ্ট ঈর্ষাও হল অনেকের। তবে দেবতাদের কথা আলাদা। তাঁরা এই সব ছোট ভাবের অনেক উপরে। তাঁরাও প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেই এসেছিলেন। তবু একজন সামান্য মানুষের কাছে হেরে গিয়েও তাঁদের মনে কোন ক্ষোভ দেখা দিল না। বরং তাঁরা

নলকে নানা রকম বর দিলেন। অগ্নি বললেন, 'তুমি আমাকে ডাকলেই আমি আসব।' যম বললেন, 'তুমি যা রাঁধবে তার অমৃতের মতো স্বাদ হবে।' বরুণ বললেন, 'তুমি ডাকলে আমিও আসব। তাছাড়া এই মালা তোমাকে দিলাম, এর ফুল কখনো শুকোবে না।' ইন্দ্র বললেন, 'শেষে তুমি স্বর্গে গিয়ে পরম সুখে থাকবে।'

এর পর মহা ঘটা করে নল-দময়ন্তীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কিছু দিন পরে রাজা নল যখন তাঁর সুন্দরী লক্ষ্মীরাণীকে নিয়ে নিষধ দেশে ফিরে গেলেন প্রজারা আর আনন্দ রাখার জায়গা পেল না। আর শুধু প্রজারা কেন, অনেক শত্রুও শত্রুতা ভুলে, অস্ত্র ফেলে, নিষধ-রাজের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করল।

সুখে শান্তিতে কয়েক বছর কেটে গেল। রাজা রাণীর ইন্দ্রসেন নামে একটি ছেলে আর ইন্দ্রসেনা বলে একটি মেয়ে জন্মাল। তাঁদের সুখের পাত্র যেন উপচে পড়তে লাগল। কিন্তু এই পৃথিবীতে চিরকাল সমান সুখে কারো কাটে না। নল-দময়ন্তীরও দুঃখের দিন এগিয়ে এল। সে দুঃখের সূত্রপাত হয়েছিল অনেক দিন আগে, দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের সময়ে। যদিও তাঁরা কেউ সে কথা জানতেন না।

সেদিন চার দেবতা সন্তুষ্ট মনে স্বর্গে ফিরছিলেন, পথে কলি আর দ্বাপর বলে দু-জন ছোট দেবতার সঙ্গে দেখা। তাঁরা নাকি দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় যাচ্ছেন! সভা শেষ হয়ে গিয়েছে আর দময়ন্তী মানুষ নলের গলায় মালা দিয়েছেন শুনে, কলি রেগে অগ্নিশর্মা হলেন। দেবতা হলেও কথা ছিল।

সেই মুহূর্ত থেকেই কলি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন স্থির করলেন। দ্বাপর তাঁকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। এখন মুস্কিল হল যে যার মধ্যে কোনো পাপ নেই, কোনো খুঁত নেই, তাকে বশ করা যায় না। কলি অদৃশ্যভাবে নলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগলেন. কোনো দিন-ও কোথাও এতটুকু দোষ দেখতে পেলেই, তার সুবিধা নিয়ে নলের দেহে প্রবেশ করে, তাঁর সুবুদ্ধি নষ্ট করে দেবেন।

সে সুযোগ পেতে এগারো বছর কেটে গেল। তারপর একদিন নল

সন্ধ্যাবেলায় পূজায় বসবার আগে পা ধুতে ভুলে গেলেন। সেই অশুদ্ধ শরীরেই অন্যমনস্কভাবে উপাসনা করতে লাগলেন। এতদিন পরে একটা খুঁত খুঁজে পেয়ে কলি কি সে সুযোগ ছাড়েন! সঙ্গে সঙ্গে নলের দেহে ঢুকে তাঁর বুদ্ধি বিফল করে দিলেন। তারপর নলের ভাই পুষ্করকে গিয়ে কলি বললেন, 'যদি রাজা হতে চাও, তাহলে এই বেলা নলকে পাশা খেলায় ডেকে, তাকে হারিয়ে তার সর্বস্ব জিতে নাও—সিংহাসন, রাজ্য, ধনরত্ন, লোকজন, সব।'

পুষ্কর বড়ই বোকা। সে বলল, 'তাহলে তো খুব ভালোই হয়। কিন্তু আমি যে পাশা খেলতে পারি না। কলি বললেন, 'কোনো ভয় নেই, আমি তোমাকে জিতিয়ে দেব। তুমি শুধু নলকে পাশা খেলায় ডাক দাও।'

যেমন কথা তেমনি কাজ। পাশা খেলতে বসে কলির প্রভাবে নল সব ভুল চাল দেন। দেখতে দেখতে একে একে তাঁর সব কিছু হাত-ছাড়া হয়ে যেতে লাগল। দময়ন্তী কেঁদে কত বারণ করলেন, নল কান দিলেন না, তিনি তখন কলির বশ।

দময়ন্তী প্রজাদের ডাকলেন, তাদের কথা যদি রাজা শোনেন। নল কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখাই করলেন না। দময়ন্তী তখন নিরুপায় হয়ে, বিশ্বাসী সারথি বা বার্ষ্ণেয়কে দিয়ে ছেলেমেয়েকে বিদর্ভ দেশে নিজের বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। বার্ষ্ণেয়ও আর ফিরলেন না। রথ আর ঘোড়া বিদর্ভে রেখে, নিজে অযোধ্যায় গিয়ে ঋতুপর্ণ রাজার সারথি হলেন। ছেলে মেয়ে দাদামশায়ের কাছে নিরাপদে রইল। এদিকে নলের শরীরে কলির দাপট সমানে চলেছে। তাঁর বশ হয়ে অমন ধার্মিক রাজা নল,যথাসর্বস্ব হেরেও থামলেন না। তাঁর সাজপোশাক, হাতি ঘোড়া রথ, অনুচর চাকর-বাকর, অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই বাকি রইল না। শেষ পর্যন্ত এক-খানা মাত্র কাপড় পরে, গায়ে একটা চাদর পর্যন্ত না জড়িয়ে, হতভাগিনী দময়ন্তীকে নিয়ে তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। লক্ষ্মীছাড়া পুষ্কর দাদার সর্বনাশ করেও সন্তুষ্ট নয়। সে এখন রাজা, দেশবাসীরা তার প্রজা। সে হুকুম দিল, নলের সঙ্গে যে কথা বলবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। পুষ্কর যে

কত নিষ্ঠুর, তা প্রজাদের অজানা ছিল না। তারা ঘরে বসে কেঁদে ভাসাতে লাগল, দুঃখী নলকে কেউ সাহায্য করল না।

খালি গায়ে, পায়ে, লোকের সামনে না বেরিয়ে, নল বনের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। ফলমূল তাঁদের খাওয়া; গাছতলায় তাঁদের শোয়া। বড় কষ্টে দিন কাটে। তারপর একদিন নল দেখেন এক ঝাঁক পাখি মাটিতে নেমে ঘাসের মধ্যে কি খুঁটে খাচ্ছে। পাখিদের সোনার পালক।

তাই দেখে নল ভাবলেন যদি কোনো রকমে কয়েকটাকে ধরা যায়, তাহলে মাংসও খেতে পাবেন আর পালক বেচে টাকাও পাবেন। এই ভেবে, গায়ে লতাপাতা জড়িয়ে একমাত্র কাপড়খানি পাখিদের ওপর ছুঁড়ে ফেলে মনে করলেন বুঝি ঐভাবে ওদের ধরবেন। পাখিরা খিলখিল করে হেসে, কাপড়খানি নিয়ে উড়ে পড়ল। যাবার সময়ে বলে গেল, 'আমাদের চিনতে পারলে না, রাজা? আমরা হলাম সেই পাশা! সব হেরে গিয়ে কাপড়টা নিয়ে বড় যে পালাচ্ছিলে! তাই সেটিকেও আমরা উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম!' এই বলে তারা উড়ে গেল।

পাতার পোশাক গায়ে দময়ন্তীর কাছে গিয়ে, নল তাঁর দুর্দশার কথা বললেন। তারপর যা বললেন, তাতে দময়ন্তীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রাজা বললেন, 'দেখছ কত পথ এখান থেকে বেরিয়ে অবন্তীনগর আর ঋক্ষবান পাহাড় ঘুরে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। ঐ যে বিন্ধ্যপাহাড় আর পয়োষ্ণী নদী দেখা যাচ্ছে। তার তীরে মুনিদের আশ্রম আছে। এই পথে গেলে বিদর্ভে যাওয়া যায় আর ঐ পথ কোশলায় গেছে।'

দময়ন্তী বললেন, 'এ-সব কথা আমাকে বল না। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। মানুষের সর্বস্ব গেলেও যদি স্ত্রী কাছে থাকে, তাহলে সে-ই হয় তার সব দুঃখের ওষুধ। তুমি আমাকে ফেলে চলে গেলে, আমি বাঁচব না।'

তাঁকে ভুলোবার জন্য নল বললেন, 'আহা, আমি কি সে-কথা বলেছি? তোমাকে ছেড়ে আমিই বা কি করে বাঁচি?'

দময়ন্তীর বড় বুদ্ধি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে আমাকে বিদর্ভের পথ চেনাচ্ছ কেন? সেখানে যেতে হয় চল, দুজনেই যাই।

বাবা তোমাকে বুকে করে রাখবেন।'

নল বললেন, 'এই বেশে, এমন সর্বস্বান্ত হয়ে, আমি কারো কাছে যেতে পারব না।' এই ভাবে কথা বলতে বলতে তাঁরা বনের এক নির্জন জায়গায় এসে পৌঁছলেন। খিদে তেষ্টায় পথকষ্টে দময়ন্তীর পা আর চলে না। বিশ্রাম করবার জন্য দুজনে গাছতলায় বসলেন। দেখতে দেখতে দময়ন্তী ঘুমিয়েও পড়লেন। কিন্তু নলের চোখে ঘুম নেই। নানান্ ভাবনা তাঁকে সাপের মতো দংশাতে লাগল।

তার উপর কলি তাঁর মনে দুষ্ট বুদ্ধি যোগাতে লাগলেন। রাজার মনে হল, এখন দময়ন্তীকে ফেলে তিনি যদি কোনো দূরদেশে চলে যান, তাহলে দময়ন্তী বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবেন! সেখানে ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি সুখেই থাকবেন। নলের কপালে যা আছে তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

আমার মনে হল, 'এ কি ভাবছি আমি! এই ঘোর বনে কোমলা রাজকন্যা কি করে একা থাকবেন! পথ চিনে যাবেনই বা কি করে?

কলি আরো দুর্বুদ্ধি যোগাতে লাগলেন। নল ভাবলেন, তাছাড়া গায়ে পাতা জড়িয়ে যাবই বা কোথায়? এমন সময় চেয়ে দেখেন সামনে একটা তলোয়ার পড়ে আছে। বলা বাহুল্য, এ-ও কলির কারসাজি। তলোয়ার দেখে নলের মনে আশা হল। 'এটা দিয়ে ঘুমন্ত দময়ন্তীর শাড়ির আধখানা কেটে, তাই গায়ে দিয়ে তো বেশ লোকসমাজে বেরোনো যায়! সঙ্গে সঙ্গে তাই করলেন। তবু যেতে পারছিলেন না। কলির বশ হয়েও ধার্মিক, রাজার মন থেকে ধর্মবোধ যাচ্ছিল না। একটু এগিয়ে যান, তো বারেবারে ফিরে আসেন, আহা, ঘুম থেকে উঠে সে না-জানি কি করবে! শেষ পর্যন্ত কিন্তু কলি-ই জয়ী হলেন। এক সময়ে নল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালেন।

দময়ন্তীর যখন ঘুম ভাঙল, তখন তাঁর অবস্থার কথা ভাবা যায় না। নল যে তাঁকে সত্যিই ত্যাগ করেছেন, এ-কথা তাঁর সহজে বিশ্বাস হচ্ছিল না। চিৎকার করে তাঁকে ডেকে ডেকে দময়ন্তী ছুটে বেড়ালেন। মাঝে মাঝে কান্নায় ভেঙে পড়েন; মাঝে মাঝে জ্ঞান হারান। নিজের

দুঃখের চিন্তা নেই। খালি বলেন একা একা নলের না জানি কত ক্লেশ হচ্ছে। যারা তাঁকে এত কষ্ট দিচ্ছে দময়ন্তী তাদের শাপ দিতে লাগলেন। নিজের বিপদের দিকে দৃষ্টি নেই। এক সময় একটা ভীষণ অজগর তাঁর দিকে তেড়ে এল। মরতে তাঁর এতটুকু ভয় ছিল না। মরলে তো সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়োবে। কিন্তু তাহলে নলের যে বড় কষ্ট হবে। এই সময় একজন ব্যাধ হঠাৎ এসে সাপটাকে মেরে ফেলল। যাকে দেখবার কেউ থাকে না, ভগবান তাকে দেখেন।

আরেকবার একটা হিংস্র সিংহ তাঁকে আক্রমণ করতে গিয়েও, কিছু না করে চলে গেল। এমনি করে দময়ন্তী মুনিদের আশ্রমে পৌঁছলেন। তাঁদের কাছে কেঁদে নলের খবর জানতে চাইলে, তাঁরা অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বাছা, হতাশ হয়ো না, শীঘ্রই তোমার স্বামীকে ফিরে পাবে।' তারপরেই দময়ন্তী দেখেন কোথায় মুনি, কোথায় আশ্রম। চারদিক শূন্য, কোথাও কিছু নেই।

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তবে কি সবই স্বপ্ন? একটা নদীর ধারে পৌঁছলেন। কি করে পার হবেন? দেখলেন এক দল সওদাগর হাতি ঘোড়া গাধার পিঠে জিনিসপত্র সাজিয়ে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ বন থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে দেখে, সওদাগরদের কেউ কেউ ভয় পেলেও, তাদের দলের পাণ্ডা শুচি বললেন, তাঁরা চেদীর রাজা সুবাহুর কাছে যাচ্ছেন। দময়ন্তীকে নিয়ে যেতে তিনি রাজি হলেন।

সন্ধ্যায় এক সুন্দর সরোবরের ধারে তাঁরা তাঁবু করলেন। সারা দিনের ক্লান্তির পর দময়ন্তী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। রাতে একদল বুনো হাতি তাঁদের তাঁবু তচনচ করে দিয়ে বহু লোকজনকে মেরে ফেলল। আর বনে দাবানল লাগাতে, ভীষণ ক্ষয়-ক্ষতি হল। হতভাগ্য সওদাগরদের বেশির ভাগই হতাহত হলেন। তাঁদের জন্তুজানোয়ার ছিন্নভিন্ন। জিনিসপত্রের বেশির ভাগ ছাই। অনেকের ধারণা হল এই অজানা অচেনা আধাপাগল মেয়েটিই অপয়া, একে মেরে ফেলা উচিত। ভাগ্যিস অন্য কয়েকজনের সুবুদ্ধি হল, নইলে সেদিনে দময়ন্তীর কপালে দুঃখ ছিল।

সে যাই হোক,সওদাগররা তাঁকে ফেলে কাঁদতে কাঁদতে চেদীরাজ্যে চলে গেলেন। দময়ন্তীও পিছন পিছন চললেন। সন্ধ্যার সময়ে তাঁরা রাজধানীতে পৌঁছলেন। তখনো দময়ন্তীর দুঃখের শেষ নেই। রাস্তার দুষ্টু ছেলেরা পাগলি! পাগলি! বলে তাঁকে বিরক্ত করতে লাগল। রাজার মা ছাদে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি এমন সুন্দর মেয়ের এরকম লাঞ্ছনা দেখে দাসী পাঠিয়ে তাকে কাছে আনালেন। রাজার মায়ের মনে হল এ বড় ঘরের মেয়ে না হয়ে যায় না, অথচ গায়ে একটা গয়না নেই, ছেঁড়া কাপড় পরে পথে পথে ঘুরছে। দময়ন্তীকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি নামধাম গোপন করে যতটা সম্ভব নিজের দুঃখের কাহিনী বললেন। রাজমাতার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন। দময়ন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার কাছে থাক, মা। আমি লোক পাঠিয়ে তোমার স্বামীর খোঁজ করছি।'

তারপর রাজার মা নিজের মেয়ে সুনন্দাকে ডেকে বললেন, 'এই দেখ, তোমার জন্য কেমন সুন্দর সখী পেয়েছি।' সুনন্দাও তাঁকে দেখেই ভালোবেসে ফেললেন। আর কখনো তাঁকে কাছছাড়া করলেন না।

এদিকে নল তো দময়ন্তীর কাছ থেকে পালিয়ে আরো গভীর বনে ঢুকলেন। এদিকে বনে তো দাবানল লেগেছে। নলের মনে হল সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে থেকে কে যেন কাতর গলায় তাঁর নাম ধরে ডাকছে। ডাক শুনেই নল সেই দিকে ছুটে গেলেন। দেখেন প্রকাণ্ড এক সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আগুনের কাছ থেকে পালাবার তার শক্তি নেই।

সাপ বলল, 'আমার নাম কর্কোটক। নারদের শাপে আমাকে এখানে পড়ে থাকতে হবে, যতদিন না নলরাজা আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।' এই বলেই সাপটা নলের কড়ে আঙুলের মতো ছোট হয়ে গেল আর নল তাকে খুব সহজেই আগুনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে আনতে পারলেন। তাছাড়া সেই স্বয়ম্বর সভার সময় থেকেই অগ্নিদেব নলের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি নিজের থেকেই সরে গেলেন।

তারপর সাপ বলল, 'রাজা নল, তুমি গুনে গুনে এখান থেকে দশ পা

এগোও তো দেখি।' রাজা তাই করলেন। অমনি সাপ তাঁকে কুট্ করে কামড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নলের গা বিষের জ্বালায় একটুও জ্বলল না বটে ?' কিন্তু তাঁর ঐ দেবতার মতো সুন্দর চেহারা কালো কুচ্ছিৎ হয়ে গেল।

নল আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা হল ?'

সাপ বলল, 'ভেবে দেখ রাজা, আমি তোমার কত উপকার করলাম। পুষ্কর কিম্বা অন্য শত্রুরা কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না। আমার বিষের জ্বালাও তুমি টের পাচ্ছ না, কারণ কলিই তার ষোল আনা ভোগ করছে। এর পর আর কোনো জানোয়ার তোমাকে কখনো কামড়াবে না। তুমি এবার অযোধ্যায় গিয়ে, রাজা ঋতুপর্ণের সারথির কাজ নিও। তোমার নাম হোক বাহুক। তোমার মতো কেউ অশ্বচালনা করতে পারে না আর পাশা খেলায় ঋতুপর্ণের জুড়ি নেই। তোমরা দুজনে দুজনার বিদ্যেটি শিখে নিও। তুমিই আগে রাজাকে ঘোড়া চালানো শিখিয়ে দিও। তাহলে তিনি খুশি হয়ে, তুমি যা চাইবে তাতেই রাজি হবেন। তারপর আবার পাশা খেলে তোমার রাজ্য উদ্ধার কর। এই দুখানি কাপড় নাও। এগুলি গায়ে দিলেই আবার তোমার আগের রূপ ফিরে পাবে।' এই বলে কর্কোটক বাতাসে মিলিয়ে গেল।

অযোধ্যা পৌঁছতে নলের দশদিন সময় লাগল। ঋতুপর্ণ সভায় বসে ছিলেন। নল সেখানে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আমার নাম বাহুক। আমার মতো কেউ অশ্বচালনা করতে পারে না। তা ছাড়া আমার অন্যান্য গুণও আছে ; হঠাৎ কোনো শক্ত কাজ করবার দরকার হলে, আমি তাও করে দেব। আমাকে একটা কাজ দিন।'

ঋতুপর্ণ খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ তাই হবে। তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালানো আমার বড়ই শখ। তোমাকে মাসে দশ হাজার মোহর দেব। বার্ষ্ণেয় আর জীবন তোমাকে সাহায্য করবে।'

এইভাবে নল কাজে বহাল হলেন। সারাদিন দক্ষভাবে কাজকর্ম করেন ; সকালবেলায় কাজ শেষ হলে, কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে দময়ন্তীর জন্য কাঁদেন। জীবন এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করে নলকে

বলল, 'বাহুক, তুমি কার জন্য এমন করে কাঁদ?' নল নামধাম না বলে খালি বললেন, 'আমার লক্ষ্মী স্ত্রীকে ত্যাগ করে এসেছি, তার জন্যই কাঁদি।'

এদিকে বার্ষ্ণেয় দময়ন্তীর ছেলে-মেয়েকে তাঁর বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিলেন। তাঁর মুখে দময়ন্তীর বাবা ভীমরাজা যেই শুনলেন যে সর্বস্ব খুইয়ে, নল সস্ত্রীক পথে বেরিয়ে পড়েছেন, অমনি তাঁদের খোঁজে তিনি দেশে দেশে চর পাঠালেন। বলে দিলেন নল-দময়ন্তীকে যে বিদর্ভে এনে দিতে পারবে, তাকে অজস্র পুরস্কার দেবেন। দুঃখের বিষয়, একজন বাদে চরদের মধ্যে সকলেই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এল।

চরদের মধ্যে সুদেব নামে একজন ভারি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি নানা দেশ ঘুরে শেষে চেদীরাজ্যে পৌঁছে, রাজকুমারী সুনন্দার নতুন পাখীটিকে লক্ষ্য করলেন। গরীবের মতো বেশবাস, মুখখানি বড় সুন্দর, কিন্তু গভীর দুঃখে ভরা। হঠাৎ কেমন চেনাচেনা লাগল! আর থাকতে না পেরে তিনি দময়ন্তীর কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনার পিতার আদেশে দেশে দেশে আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনার ছেলেমেয়ে সহ তাঁরা সকলেই শারীরিক ভালো আছেন, কিন্তু চোখের জল আর শুকোয় না।'

এ কথা শুনে দময়ন্তী কেঁদে ভাসালেন। সখীর কান্না সইতে না পেরে সুনন্দা তাঁর মাকে ডাকলেন। রাজমাতা সুদেবের কাছে সব কথা শুনে তাজ্জব বনে গেলেন। সুদেব বললেন, দময়ন্তীর দুই ভুরুর মাঝখানে ঠিক পদ্মফুলের আকারের ছোট্ট একটা জরুল আছে, তাই দিয়ে তাঁকে চেনা যায়, তখন রাজমাতার মনে আর কোনো সন্দেহই রইল না। তারপর যখন সুনন্দা একখানা গামছা ভিজিয়ে দময়ন্তীর কপালে ঘষে দেখল দুই ভুরুর মাঝখানে সুন্দর একটি পদ্মফুল জ্বলজ্বল করছে, তখন সুনন্দা আর রাজমাতা দময়ন্তীকে বুকে জড়িয়ে কি কান্নাই যে কাঁদলেন তার ঠিক নেই।

রাজমাতা বললেন, 'ওরে আমি কেমন লক্ষ্মীছাড়ি যে তুই আমার

মায়ের পেটের বোনের মেয়ে আর তোকে দেখেও চিনতে পারিনি! ছোট বেলায় আমার বাপের বাড়িতে তোকে কত কোলে করেছি! আমরা দশানি দেশের রাজা সুদামের মেয়ে। ওরে এ যে তোর নিজের বাড়ি।'

দময়ন্তী মাসিকে প্রণাম করে কেঁদে বললেন, 'মাসিমা, এখানে আমি বড় সুখে আছি, কিন্তু বাবার জন্য আর আমার ছেলেমেয়ের জন্য আমার মনে বড় কষ্ট। বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

তখনি রাজমাতার হুকুমে পাইক, বরকন্দাজ, সেপাই ঢাল তলোয়ার নিয়ে সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হল। সোনার সাজ দেওয়া হাতির দাঁতের পাল্‌কি এল। স্নান করে, উপযুক্তভাবে সেজেগুজে মাসির আর সুনন্দার কাছে বিদায় নিয়ে দময়ন্তী বাপের বাড়ি গেলেন। সেখানে দেশময় আনন্দ কোলাহল পড়ে গেল। হারানো মেয়ে ঘরে এসেছে, দুঃখীর ধন বুকে ফিরেছে, পৃথিবীতে এমন সুখের তুলনা নেই।

কিন্তু বাবা মা ছেলেমেয়ে পেয়ে দময়ন্তী যতই সুখী হন না কেন, হতভাগ্য নলের কথা ভেবে সর্বদা তাঁর মনটা হাহাকার করত। তাই দেখে মা-বাবার কি কষ্ট। অমনি তাঁরা আরেকবার দেশ দেশান্তরে নলের খোঁজে ব্রাহ্মণ চরদের পাঠালেন। দময়ন্তী নিজের মুখে বলে দিলেন, 'আপনারা দেশে দেশে গিয়ে, নগরে গ্রামে গঞ্জে হাটে, গরীবের কুটিরে আর রাজার প্রাসাদে এই কথা বারবার বলবেন—বনের মধ্যে ঘুমন্ত দুঃখিনীকে ফেলে তুমি কোথায় পালিয়ে গেছ ? সে যে আধখানা কাপড় পরে তোমার জন্য চোখের জল ফেলছে!—এ কথার কেউ যদি উত্তর দেন, তাহলে তাঁর নামধাম আর সব বৃত্তান্ত জেনে আসুন।

আগের বারের মতোই একে একে একজন বাদে সব চররা ফিরে এলেন। এলেন না শুধু পর্ণাদ। তিনি ঘুরতে ঘুরতে অযোধ্যায় পৌঁছে, ঋতুপর্ণের সভায় ঐ কথা বললেন। কেউ কোনো উত্তর দিল না। খালি বাহুক নামে রাজার সারথি চুপি চুপি তাঁকে ডেকে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গেল। লোকটি দেখতে বড় খারাপ, কুচকুচে গায়ের রং, মাথায় এতটুকু বেঁটে, তার আবার সেই তুলনায় হাত দুটি আরো ছোট। বাহুক

পর্ণাদকে বলল, 'দময়ন্তীকে বলবেন নিতান্ত পাগল হয়েই নল তাঁকে ছেড়ে যান। সেই ইস্তক তিনি মনোকষ্টে জ্বলেছেন। দময়ন্তী যেন তাঁকে ক্ষমা করেন।'

এ কথা শুনে পর্ণাদ এক মুহূর্তও দেরি না করে, তখনি রওনা দিলে দিন রাত না খেয়ে, বিশ্রাম না করে অল্প দিনের মধ্যেই বিদর্ভদেশে পৌঁছে দময়ন্তীকে সব কথা জানালেন। দময়ন্তী তাঁকে অনেক আশীর্বাদ করে, নিজের মাকে বললেন, 'মা, সুদেবকে আমি বিশেষ কাজে একবার অযোধ্যায় পাঠাব, তুমি কিন্তু বাবাকে কিছু বল না।'

দুঃখিনী মেয়ের কথায় মা কোনো আপত্তিই করলেন না। দময়ন্তী তখন সুদেবকে ডেকে বললেন, 'ভাই, তুমি ছাড়া কেউ আমার এই বিশ্বস্ত কাজ করতে পারবে না। একবার অযোধ্যায় রাজা ঋতুপর্ণের সভায় গিয়ে জানাও যে দময়ন্তীর আবার স্বয়ম্বর হবে। তাঁদের কেউ যদি বিদর্ভে আসতে চান, তাহলে ঐদিনই রাত শেষ হবার আগেই এখানে পৌঁছতে হবে। কারণ সূর্য ওঠার আগেই স্বয়ম্বর শেষ করতে হবে। দময়ন্তী আরো বললেন, এক রাতের মধ্যে রথ চালিয়ে অযোধ্যা থেকে বিদর্ভে আসা একমাত্র নল ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। বাহুক যদি সত্যি নল-ই হন, তাহলে এ-কাজ শুধু তিনিই করতে পারবেন। বাহুকের চেহারা যেমন-ই হক না কেন, তখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে তিনি নল ছাড়া কেউ নন।' রাণী আর সুদেব দুজনেই দময়ন্তীর বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলেন না।

সুদেব সেই ভাবেই কাজ করলেন। ঋতুপর্ণের সভায় স্বয়ম্বরের কথা ঘোষণা করবেই, ঋতুপর্ণ যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বাহুককে ডেকে বললেন, 'শুনলাম দময়ন্তীর আরেকবার স্বয়ম্বর হবে। মুস্কিল হল রাত শেষ হবার আগেই বিদর্ভে পৌঁছতে হবে। পারবে আমাকে ঐ সময়ের মধ্যে নিয়ে যেতে?'

এ-কথা শুনে প্রথমটা বাহুকরূপী নল স্তম্ভিত হলেও, পরমুহূর্তেই বুঝলেন তাঁকে বিদর্ভে নিয়ে যাবার জন্য এটা হল দময়ন্তীর কৌশল। স্বয়ম্বর-টয়ম্বর কিছু নয়। তাই তিনি বললেন, 'আপনার অনুমতি পেলেই

পারি বৈ কি, মহারাজ।'

রাজা বললেন, 'তাহলে এক্ষুণি আটটি বাছাই করা ঘোড়া তৈরি কর। যে সে ঘোড়ার কাজ নয়।' অল্পক্ষণ পরেই বাহুক আটটি রোগা ঘোড়া এনে হাজির করল। ঋতুপর্ণের চক্ষু স্থির! 'এই মড়াখেকো ঘোড়া নিয়ে তুমি এক রাতে বিদর্ভ পৌঁছবে ভেবেছ!' বাহুক সামান্য হেসে বলল, 'কেউ পারলে এরাই পারবে, মহারাজ। এরা পক্ষিরাজ ঘোড়া।'

ঋতুপর্ণ আর আপত্তি করলেন না। ঘোড়া রথে জোতা হল। ঋতুপর্ণ সন্দেহের সঙ্গে তাদের দিকে চেয়ে রথে চড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলো মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়ল; বাহুক কিন্তু কিছুতেই অন্য ঘোড়া নিতে রাজি হল না। ওদের মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে, কানে কানে মিষ্টি কথা বলে আবার খাড়া করল। তারপর বার্ষ্ণেয়কে রথের পিছনে দাঁড় করিয়ে রওনা দিল।

বাহুক তো আসলে রাজা নল, অশ্ব চালনায় যার জুড়ি পৃথিবীতে নেই। একটু পরেই বোঝা গেল রথ শুধু চলছে না, ভীষণ বেগেই চলছে! তারপর ঐ আটটি রোগা ঘোড়া রথসুদ্ধ মাটি ছেড়ে আকাশ নিল। এ-সব দেখে শুনে বার্ষ্ণেয় একেবারে বোবা বনে গেল। মনে মনে খালি বলতে লাগল, 'এ লোকটা যদি এমন কালো-কুচ্ছিৎ না হত, তাহলে ভাবতাম এ রাজা নল ছাড়া কেউ হতে পারে না।'

ঋতুপর্ণও একেবারে স্তম্ভিত। আকাশ দিয়ে রথ বিদ্যুৎবেগে উড়ে চলেছে। কত নগর গ্রাম বন প্রান্তর পার হয়ে যাচ্ছে। হু-হু করে এমনি বাতাস বইছে যে গায়ের চাদরখানি পর্যন্ত উড়ে গেল!

রাজা বললেন, 'ও বাহুক, থামো, থামো, চাদরখানা তুলতে হবে।' বাহুক বলল, 'সে আর তোলা যাবে না। এতক্ষণে আমরা চার ক্রোশ পথ পার হয়ে গেছি।'

রাজা কেমন গোঁ ধরল। ভাবলেন, সারথির বড্ড বাড় বেড়ে যাচ্ছে। আমিও যে অনেক ক্ষমতা ধরি, তার প্রমাণ দিতে হবে। পথের ধারে একটা বহেড়া গাছ দেখিয়ে বললেন, 'দেখবে আমি কেমন গুণতে পারি? ঐ গাছে পাঁচ কোটি পাতা আর দুহাজার পঁচানব্বুইটা ফল

আছে।'

বাহক অমনি রথ থামিয়ে বলল, 'তাহলে গাছটা কেটে, গুণে দেখতে হয়।' রাজা আপত্তি করলেন, দেরি হয়ে যাবে! কিন্তু বাহুক ছাড়ল না। গাছ কেটে গুণে দেখল সত্যিই রাজার কথা ঠিক। তখন সে বলল, 'মহারাজ আমি আপনাকে অশ্বচালনার বিদ্যা শিখিয়ে দেব, আপনি যদি এই গণনার বিদ্যা আমাকে শেখান।' রাজা খুশি হয়ে তখুনি বাহুককে গণনা শিখিয়ে দিলেন। তাছাড়া অক্ষবিদ্যাও শেখালেন। অক্ষবিদ্যা দিয়ে পাশা বশ করা যায়।

ঐ পবিত্র বিদ্যা যে মুহূর্তে বাহক-রূপী নল আয়ত্ত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে কলি তাঁর শরীর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। নল তাঁকে শাপ দিয়ে গেলেন, কলি হাত যোড় করে ক্ষমা চাইলেন। নল তাঁকে ক্ষমা করলেন। কলি সেই বহেড়া গাছটিকে আশ্রয় করলেন। অমনি গাছটি শুকিয়ে মরে গেল।

দিব্য চক্ষু না থাকাতে ঋতুপর্ণ কলিকে দেখতে পাননি। খালি গাছটাকে শুকিয়ে যেতে দেখে অবাক হয়েছিলেন। সে যাই হক, আবার নিজেকে ফিরে পেয়ে নল দ্বিগুণ উৎসাহে রথ চালিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিলপুরে রথ নামালেন। চেহারা তাঁর তখনো বাহুকের মতো। তাঁর মধ্যে এত বড় একটা পরিবর্তন হয়েছে, বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারল না।

এদিকে রাজধানী এসে ঋতুপর্ণ স্বয়ম্বরের কোনো আয়োজন দেখতে পেলেন না। দময়ন্তীর বাবা ভীমও হঠাৎ এমন বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন দেখে যেমন খুশি হলেন, তেমনি আশ্চর্যও কম হলেন না। তাঁকে আদর করে ডেকে ভীমরাজ তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ঋতুপর্ণ বুঝলেন কোথাও একটা কিছু গোলমাল আছে। তিনি বললেন, 'এমনি আপনাদের দেখতে এসেছি।'

ভীম ভারি বুদ্ধিমান। তিনিও বুঝলেন এর মধ্যে আরো কথা আছে। ঋতুপর্ণের উপযুক্ত আপ্যায়নের ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হল। বাহুক রথশালায় রথ তুলে, ঘোড়া দলাইমলাই করে, রথের মধ্যেই

শোবার যোগাড় করতে লাগল।

এদিকে দময়ন্তী রথের শব্দ শুনে ভাবছিলেন নল রাজা রথ চালালে এমনি শব্দ হয়। বাহুককে দেখবার জন্য অনেক আগ্রহে আড়াল থেকে লক্ষ্য করে, তিনি হতাশ হলেন। এ কি করে রূপবান নল হতে পারে? হয়তো নলের কাছে রথ চালানো শিখে থাকবে। পরক্ষণেই মনে হল চেহারা যাই হক চালচলন, হাবভাব নাকি বড় বেশি নলের মতো। দময়ন্তীর মনে বড় সংশয় উপস্থিত হল।

শেষটা কেশিনী বলে তাঁর এক বুদ্ধিমতী দাসীকে তিনি বাহুকের কাছে পাঠালেন। বলে দিলেন ওঁর পরিচয় জেনে আসতে হবে; তাছাড়া ব্রাহ্মণ চরদের যে কথা প্রচার করতে বলা হয়েছিল, সেই কথা বাহুককে শোনাতে হবে। শুনে তিনি কি করেন তা বলতে হবে।

কেশিনী বুদ্ধি করে বাহুকের সঙ্গে গল্প জুড়ল। বাহুক বলল সে ঋতুপর্ণের সারথি। ঋতুপর্ণ শুনেছিলেন আজ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর, তাই তাঁকে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় টানা রথ চালিয়ে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গী আগে মহারাজ নলের সারথি ছিল। সঙ্গীর নাম বার্ষ্ণেয়। সে-ও এখন ঋতুপর্ণের সারথি।

কেশিনী জিজ্ঞাসা করল, 'বার্ষ্ণেয় থাকতে আবার রাজা কেন আপনাকেও সারথি করেছেন?'

বাহুক বলল, 'আমি শুধু রথই চালাই না, খুব ভালো রাঁধতেও পারি।' তখন কেশিনী আসল কথা পাড়ল, 'আচ্ছা বার্ষ্ণেয় কি রাজা নলের বিষয়ে কিছু জানেন?' বাহুক বলল, 'নলের খবর নল ছাড়া কেউ জানে না।' কেশিনী তবু ছাড়ল না, 'তাই যদি হয়, তাহলে আপনাদের রাজার সভায় আমাদের ব্রাহ্মণ যখন ডেকে বলেছিলেন দুঃখিনীকে বনে ফেলে তুমি কোথায় গেলে? সে তোমার জন্য কাঁদছে। তখন কেন আপনি তার উত্তর দিয়েছিলেন? দময়ন্তীর বড় ইচ্ছা আপনার ঐ উত্তর শোনেন।'

এ-কথা শুনে বাহুকের চোখে জল এল। সে বলল, 'আমি বলেছিলাম নল রাজা পাগলের মতো হয়ে এমন কাজ করেছিলেন। তার পর থেকে

তিনি মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন। দময়ন্তী যেন তাঁকে ক্ষমা করেন।'

এই বলে দু হাতে মুখ ঢেকে বাহুক কেঁদে ফেলল। এ সব কথা শুনে দময়ন্তী বললেন, 'কেশিনী, তুমি বাহুক কখন কি করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। আগুন চাইলে আগুন দেবে না। জল চাইলে তাও যেন না পান।'

কেশিনী তাই করল। বাহুককে দেখে সে অবাক হল। খুব নিচু দরজা দিয়ে যেতে বাহুক মাথা নোয়ান না। দরজা আপনি বড় হয়ে যায়। জল তেষ্টা পেলে জল চান না। খালি কলসীর দিকে তাকান, অমনি কলসী জলে ভরে ওঠে। আগুন দরকার হলে মুখে কিছু বলেন না। খড়ের গোছা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবেন, খড় আপনি জ্বলে ওঠে। আগুনে হাত দিলেও হাত পোড়ে না। ফুল চটকালে ফুল নষ্ট হয় না, দ্বিগুণ সুগন্ধে আর সৌন্দর্যে ভরে ওঠে।

দময়ন্তী বুঝলেন বাহুক নিশ্চয়ই নল। তবু দময়ন্তী বললেন, 'ওঁর রান্না একটু তরকারি চেয়ে আনতো দেখি। কেশিনী তাই এনে দিল। সে তরকারি খেয়ে দময়ন্তীর সব সংশয় দূর হল। এমন রান্না নল ছাড়া আর কারো সম্ভব নয়।

তারপর দময়ন্তী কেশিনীর সঙ্গে নিজের ছেলে মেয়ে ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনাকে বাহুকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বাহুক তাদের বুকে চেপে ধরে কেঁদে জানালেন। কেশিনীকে বললেন, 'আমার এই রকম ছেলে-মেয়ে ছিল।'

এরপর দময়ন্তী মা-বাবাকে সব কথা বললেন। তাঁরা বাহুককে ডেকে দময়ন্তীর সামনে এনে দিলেন। দুজনে দুজনকে দেখে কেঁদে আকুল হলেন। বাহুক বললেন তিনি কলির বশ হয়ে এমন কাজ করেছিলেন। এখন সে দুষ্ট কলি তাঁকে ছেড়ে গেছে, এবার হয়তো তাঁদের দুঃখের দিনও শেষ হল।

এরপর নল কর্কোটক সাপের দেওয়া কাপড় দুখানি পরে, তাঁকে মনে করবামাত্র, আবার তাঁর আগের চেহারা ফিরে এল। সেখানে যারা যারা ছিল, তারা এতই আনন্দিত হল যে হাসি দিয়ে তা বোঝাতে না পেরে,

হাউহাউ করে সবাই কাঁদতে লাগল।

রাজা ভীম আর তাঁর রানী কত যে খুশি হলেন, মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনিকে কত যে আশীর্বাদ করলেন আর সব সুখ যিনি দেন, সেই ভগবানকে কত যে কৃতজ্ঞতা জানালেন, তার ঠিক নেই। সারাদেশ জুড়ে খালি আনন্দ, খালি উৎসব পড়ে গেল। এই সমস্ত সুখের ব্যাপারের মধ্যে পড়ে ঋতুপর্ণ একটু বোকার মতো হাসতে লাগলেন। যে জন্য তাঁর আসা, সে স্বয়ম্বর তো হলই না, উপরন্তু তাঁর অমন ভালো সারথিটি হাতছাড়া হয়ে গেল। সব চাইতে লজ্জার বিষয় হল যে এমন একজন গণ্যমান্য রাজাকে না জেনে তিনি সারথি করে রেখেছিলেন! নলের কাছে তিনি বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

নল বললেন, 'সে কি মহারাজ, আমিই তো আপনার কাছে ঋণী। দরকারের সময় আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আমাকে গণনা করতে শিখিয়েছেন, অক্ষবিদ্যা শিখিয়েছেন। আমিই বরং এখন পর্যন্ত আপনাকে অশ্বচালনা শেখাইনি। আসুন, এবার শিখিয়ে দিই।'

তাই দিলেন নল। ঋতুপর্ণ তাঁদের অনেক প্রীতি জানিয়ে, খুশিমনে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। এরপর এক মাস নল রাজা বিদর্ভে বাস করার পর শ্বশুরকে বললেন, 'এবার অনুমতি দিন, নিজের রাজ্য উদ্ধার করার ব্যবস্থা করি।' ভীম অনেক আশীর্বাদ করে তাঁকে বিদায় দিলেন।

এতদিন পুষ্কর নিষধ দেশে দিব্যি রাজত্ব করছিল। সেখানে গিয়ে নল তাকে পাশা খেলায় ডাক দিলেন। তাই শুনে পুষ্করের কি হাসি। 'একবার সব খুইয়ে বুঝি তোমার মন ওঠেনি? বিদেশে গিয়ে বোধ হয় অনেক ধনরত্ন রোজগার করে এনেছ? এখন সেগুলোও না খোয়ালেই নয়? আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। এসো, খেলতে বসা যাক।'

মূর্খ পুষ্কর ভেবেছিল এবারও খুব সহজে নলকে হারিয়ে দেবে। দুঃখের বিষয়, এবার তার সহায় কলিও নেই, তার উপর নল অক্ষবিদ্যা শিখে এসেছেন। দেখতে দেখতে পুষ্কর সর্বস্ব হারাল। এমন কি নিজের প্রাণ অবধি পণ রেখেছিল তাও নল জিতে নিলেন। পুষ্করের তখন কি ভয়! কিন্তু মহামতি নল বললেন, 'তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি

আমার ভাই। তাছাড়া সমস্ত অপকর্ম কলিই তোমাকে দিয়ে করিয়েছে, আমি সব ক্ষমা করলাম। তোমার ধনরত্ন সব নিয়ে বাড়ি যাও। আর কখনো কোনো পাপকাজ করো না।'

এরপর পুষ্কর আর কখনো নলের কোনো অনিষ্ট করেনি। নল বিদর্ভ থেকে দময়ন্তীকে আর ছেলে-মেয়েকে আনিয়ে আবার আগের মতো ধর্মকর্মে আর প্রজাপালনে মন দিলেন।

সাবিত্রী আর সত্যবানের কথা

সেকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি বলে এক পরম ধার্মিক আর গুণবান রাজা ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। অশ্বপতির মনে তাই বড় কষ্ট। তিনি আঠারো বছর ধরে সাবিত্রীদেবীর আরাধনা করলেন। সাবিত্রীদেবী হলেন ব্রহ্মার স্ত্রী এবং সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর অশেষ ক্ষমতা। আঠারো বছর ধরে ভক্তকে রোজ আগুনে এক লক্ষ আহুতি দিতে দেখে তাঁর মন টলল। তার উপর সারা দিন উপবাসী থেকে, সূর্যাস্তের সময় একবার মাত্র সামান্য ফলমূল খেয়ে রাজার দিন কাটত। সাবিত্রীদেবীর বড় দয়া হল। তিনি রাজাকে বর দিলেন তাঁর একটি অসাধারণ সুন্দরী আর গুণবতী মেয়ে হবে।

হল-ও তাই। কয়েক মাস পরে রাণীর একটি অপরূপ সুন্দর মেয়ে হল। মনে হল তার পবিত্র রূপে রাজবাড়ি আলো হয়ে উঠেছে। সাবিত্রীদেবীর নামে রাজা মেয়ের নাম রাখলেন সাবিত্রী।

পরম যত্নে, সুন্দর শিক্ষায় ক্রমে মেয়েটি বড় হতে লাগল। যেমন তার রূপ, তেমনি তার গুণ আর বিদ্যা। তার দেহ থেকে যেন পবিত্রতার আলো ছড়িয়ে পড়ত। সেই আলো দেখে সকলে ভক্তিতে গলে যেত, রাজকুমারীকে বিয়ে করার কথা কেউ সাহস করে বলতে পারত না। ক্রমে রাজারাণীর মনে ভাবনা হতে লাগল, 'তাহলে কার সঙ্গে এমন রূপসী গুণবতী ধর্মপরায়ণ মেয়ের বিয়ে হবে?'

সেকালে আমাদের দেশের মেয়েদের অনেক স্বাধীনতা ছিল। রাজা

অশ্বপতি স্থির করলেন যথেষ্ট লোকজন, ধনরত্ন, রথ-ঘোড়া দিয়ে বুড়ো মন্ত্রীর সঙ্গে মেয়েকে দেশভ্রমণে পাঠাবেন। সে নিজে দেখে পছন্দমতো পাত্রকে বিয়ে করুক। তার মত বুদ্ধিমতী খুব দেখা যেত না।

তাই হল। নানা দেশে ভ্রমণ করলেন সাবিত্রী। কত আশ্চর্য দৃশ্য, কত নতুন নতুন জীবনযাত্রা, কত অচেনা মানুষ দেখে একদিন তাঁরা ফিরেও এলেন। কত রাজার প্রাসাদে, কত বনবাসী মুনির আশ্রমে, দেশ দেশান্তরের কত রাজপুত্র, কত পণ্ডিত, কত বণিকপুত্র, কত বনবাসী দেখে রাজকুমারী বাপের কাছে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন।

রাজার গুরু নারদও সেখানে ছিলেন। রাজা তাঁকে মেয়ের দেশ-ভ্রমণের কথা সব খুলে বললেন। তারপর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, মনের মতো কোনো রাজপুত্র দেখলে?'

সাবিত্রী সলজ্জভাবে বললেন, 'আমি দ্যুমৎসেনের ছেলে সত্যবানকে মনে মনে বরণ করেছি।'

এ-কথা শুনে নারদ মুনি চমকে উঠলেন, 'কাজটা ভালো হয়নি, মহারাজ। তাকে বরণ করা ঠিক হয়নি।'

দ্যুমৎসেন শাল্ব দেশের রাজা ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ তাঁর দুই চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়াতে, সেই সুযোগে তাঁর শত্রুরা তাঁকে রাজ্যছাড়া করেছিল। তিনি রাণীকে আর শিশু সত্যবানকে নিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন। এতদিনে সত্যবান পরম রূপবান, বিদ্বান ও বলিষ্ঠ যুবক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের আশ্রমে গিয়ে সাবিত্রী বনবাসী রাজপুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

নারদের আপত্তির কথা শুনে অশ্বপতি বললেন, 'আপনি আপত্তি করছেন কেন? সে কি ভালো ছেলে নয়?'

মুনি বললেন, 'সে অতি চমৎকার ছেলে। রূপে অশ্বিনীকুমার, তেজে সূর্যদেব, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। তার উপরে ধীর স্থির ভদ্র সরল সত্যবাদী আর ধার্মিক।'

অশ্বপতি বললেন, 'তাহলে?'

নারদ বললেন, 'বিধাতা তাকে সব দিয়েছেন, কিন্তু আয়ু দেননি।

এক বছরের মধ্যে তার মৃত্যু হবে।'

শুনে সকলে শিউরে উঠল। অশ্বপতির দুঃখ দেখে কে! 'মা, তাহলে কি করে তার সঙ্গে তোমার বিবাহ হতে পারে?' সাবিত্রী তবু বললেন, 'তাঁর আয়ু না থাকলেও, আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।'

তখন নারদ বললেন, 'মহারাজ, আপনার মেয়ের যেমন বুদ্ধি, তেমনি ধর্মজ্ঞান। সত্যবানের সঙ্গেই তার বিয়ে হোক।' এই বলে নারদ তাঁদের আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

অশ্বপতি বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে, একটা ভালো দিন দেখে মন্ত্রী, পুরোহিত আর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে রাজা দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গিয়ে উঠলেন। দ্যুমৎসেন তাঁদের আদর করে বসিয়ে যথাসাধ্য আপ্যায়ন করলেন। তারপর অশ্বপতির বাসনার কথা শুনে বললেন, 'মহারাজ, আপনার মেয়ে পরমাসুন্দরী আর তার নানা গুণও আছে। আমরা রাজ্যছাড়া গরীব বনবাসী। আমাদের আশ্রমে এত কষ্ট সয়ে মা সাবিত্রী কি সুখে থাকতে পারবে?'

অশ্বপতি বললেন, 'এখানে ছাড়া আর কোথাও সে সুখী হবে না।'

দ্যুমৎসেন বললেন, 'এমন মেয়ে আমার ঘরে এলে, আমি নিজেকে মহা সৌভাগ্যের অধিকারী বলে মনে করব।' এই ভাবে সাবিত্রী সত্যবানের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। পাত্র-পাত্রীর রূপগুণের কথা কারো অজানা ছিল না। বনবাসীরা সকলে আনন্দের সঙ্গে বর-কন্যাকে আশীর্বাদ করতে এলেন। বনের মধ্যে সামান্য আয়োজনে অতি চমৎকার ভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অশ্বপতি ও তাঁর রাণী অনুচরদের নিয়ে প্রসন্ন মনে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

মনের মতো স্বামী পেয়ে, সাবিত্রীর সুখের আর সীমা ছিল না। দামী কাপড়চোপড় গয়নাগাঁটি খুলে রেখে তিনি অন্যান্য আশ্রমবধূদের মতো গেরুয়া কাপড় পরলেন।

কি সুন্দর তাঁদের বিবাহিত জীবন। এক সঙ্গে ভগবানের নাম করতেন, গুরুজনদের সেবা করতেন, আশ্রমের সব কাজ-কর্ম সম্পন্ন

করতেন। বড় সুখে দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। সত্যবানের আয়ুও ফুরিয়ে এল।

এক বছর পূর্ণ হতে যখন তিন-চার দিন মাত্র বাকি, তখন থেকে নিদারুণ দুর্ভাবনায় সাবিত্রীর মন পূর্ণ হল। খেতে পারেন না, শুতে পারেন না, নির্দিষ্ট কাজগুলি করে যেতে লাগলেন, কিন্তু মনের মধ্যে যে কি হচ্ছিল তা ভাষায় বোঝানো যায় না। অথচ মুখে কিছু বলবার-ও উপায় ছিল না। এঁরা কিছুই জানেন না।

দেখতে দেখতে শেষের দিনটি এসে গেল। সাবিত্রী স্থির করলেন স্বামীকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করবেন না। একটু বেলা হলে যখন কুড়ুল নিয়ে সত্যবান অন্যান্য দিনের মতো কাঠ আনতে বনে যাচ্ছিলেন, সাবিত্রী এসে বললেন, 'আমিও আজ সঙ্গে যাব।' সত্যবান আপত্তি করলেন, ভাবলেন সাবিত্রীর কষ্ট হবে। কিন্তু সাবিত্রী শেষ পর্যন্ত শ্বশুর শাশুড়ির অনুমতি চাইতে গেলেন। যে মেয়ে কখনো কিছু চায় না, তার এই একটি প্রার্থনা তাঁরা তখনি পূর্ণ করলেন। সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে গেলেন।

সত্যবানের বড় আনন্দ। সাবিত্রীকে এটা দেখাচ্ছেন, ওটা দেখাচ্ছেন, ফুল পাড়লেন, ফল পাড়ছেন আর সাবিত্রী শুধু স্বামীকে দেখছেন। ফল তোলা হলে, সত্যবান কাঠ কাটতে আরম্ভ করলেন। একটু পরে কুড়ুল নামিয়ে তিনি বললেন, 'কি জানি শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। মাথা ধরেছে, গায়ে জোর পাচ্ছি না, বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।' এই বলে সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে সত্যবান চোখ বুজে শুলেন। এদিকে নারদমুনির সেই ভয়ঙ্কর কথা মনে করেও, সাবিত্রী স্থির হয়ে বসে রইলেন।

হঠাৎ সাবিত্রী দেখলেন ফাঁদ হাতে নিয়ে, একজন ভয়ঙ্কর সুন্দর পুরুষ সত্যবানের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গায়ের রং ঘোর কালো, চোখ দুটি লাল, গায়ে লাল কাপড়। তিনি একদৃষ্টে সত্যবানের দিকে চেয়ে রইলেন। তাই দেখে ভয়ে সাবিত্রীর প্রাণ উড়ে গেল।

তিনি যে মৃত্যুর দূত তা বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। অতিশয়

স্নেহের সঙ্গে কোল থেকে সত্যবানের মাথা নামিয়ে রেখে, মন থেকে ভয় দূর করে, সাবিত্রী উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দু-হাত যোড় করে বললেন :

'আপনি কে ? এখানে কেন এসেছেন ?'

সেই কালো পুরুষ বললেন, 'আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ু ফুরিয়েছে। তাকে নিতে এসেছি।'

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাঁকে নিতে আপনি নিজে এসেছেন কেন ?'

যম বললেন, 'এমন অপরূপ পুণ্যাত্মা বেশি দেখা যায় না। তাই নিজেই এসেছি।'

এই বলে নিচু হয়ে সত্যবানের দেহ থেকে তাঁর আত্মাটিকে বের করে নিয়ে, যম তাকে ফাঁদে বদ্ধ করলেন। সাবিত্রী আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সে আত্মা দেখতে বুড়ো আঙুলের মতো ছোট এক পুরুষের মতো। সঙ্গে সঙ্গে সত্যবানের শরীর এলিয়ে পড়ল।

যম ফাঁদ নিয়ে দক্ষিণ দিকে চললেন। শোকে আকুল হয়ে সাবিত্রীও পিছন পিছন চললেন। যম বললেন, 'তুমি আর এসো না। বাড়ি ফিরে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা কর।'

সাবিত্রী বললেন, 'স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর থাকা উচিত। আমরা সর্বদা একসঙ্গে ধর্মসাধনা করি। যার দয়ায় আমি তাঁর সঙ্গে যাবার বল পেয়েছি।'

যম আবার বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও। তোমার কথায় বড় খুশি হয়েছি। তোমার স্বামীর প্রাণ ছাড়া আর যা চাও, সেই বর তোমাকে দেব।'

সাবিত্রী বললেন, 'তাহলে দয়া করে আমার শ্বশুরের চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন আর তাঁর দেহে মনে অসাধারণ বল আর তেজ দান করুন।'

যম বললেন, 'তথাস্তু। এবার বাড়ি যাও।' তবু তাঁর সঙ্গে যেতে যেতে সাবিত্রী বললেন, 'স্বামীর সঙ্গে আছি, তাঁকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া আপনার কাছে থাকলেও পুণ্য হয়।

বাড়ি ফিরে কি হবে ?'

যম আবার বললেন, 'স্বামীর প্রাণ ছাড়া আরো কিছু চাও, আমি বর দেব।'

সাবিত্রী বললেন, 'তবে আমার শ্বশুর যেন তাঁর রাজ্য ফিরে পান।'

যম বললেন, 'তথাস্তু। এবার ঘরে ফেরো।'

সাবিত্রী বললেন, 'লোকে আপনাকে ধর্মরাজ বলে। আপনি পাপীকে সাজা দেন, পুণ্যবানের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। যাঁরা মহৎ, তাঁরা পরম শত্রুকেও ক্ষমা করেন। আপনার মতো মহৎ কে আছে ?'

যম বললেন, 'তৃষ্ণার্তের কাছে জল যেমন মিষ্টি তেমনই মিষ্টি তোমার কথা। সত্যবানের জীবন ছাড়া, আরেক বর চাও।'

সাবিত্রী বললেন, 'আমার বাবার ছেলে নেই। তাঁকে একশো ছেলে দিন।'

যম বললেন, 'তথাস্তু। এবার বাড়ি যাও। যা চেয়েছ সব-ই তো দিয়েছি! অনেক দূর চলেও এসেছ।' এ-কথা শুনে সাবিত্রী বললেন, স্বামীর কাছে থাকলে কেউ দূরে গেছে বলা যায় না। আমি আরো অনেক দূর যেতে চাই। আপনার সঙ্গে যেতে পারাও পরম সৌভাগ্য। আপনি ধর্মরাজ, আপনি ন্যায় আর ধর্ম রক্ষা করেন। নিজের চেয়েও আপনাকে আমি বেশি বিশ্বাস করি, তাই সঙ্গে যাচ্ছি।'

সাবিত্রীর কথা শুনে যম মুগ্ধ হলেন, 'এমন সুন্দর কথা কেউ বলে না, সাবিত্রী। সত্যবানের জীবন ছাড়া আরেকটি বর চাও।'

সাবিত্রী বললেন, 'তাহলে সত্যবানের একশো ছেলে হোক।'

যম বললেন, 'তথাস্তু। এবার বাড়ি যাও।'

সঙ্গে যেতে যেতে সাবিত্রী বললেন, 'সাধুসঙ্গ করলেই মঙ্গল হয়। তাঁদের অনুগ্রহ কখনো ব্যর্থ হয় না। তাঁরা সবাইকে রক্ষা করেন।'

যম বললেন, 'তোমার কথা যতই শুনি ততই আমার মনে ভক্তি আসে। তুমি আরো বর চাও।'

সাবিত্রী বললেন, 'আপনি সত্যবানকে নিয়ে গেলে, তার একশো ছেলে কি করে সম্ভব হয় ? তাহলে আপনার কথা যে মিথ্যা হয়ে

যাবে। সেই জন্যই তাকে ছেড়ে দিন।'

এবার যম আর তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন না। প্রসন্ন মনে সত্যবানের আত্মাকে মুক্তি দিয়ে বললেন, 'এই তোমার স্বামীকে ছেড়ে দিলাম। চারশো বছর তোমরা সুখে সংসার কর। আশীর্বাদ করি তোমাদের একশো ছেলে হোক।' এই বলে যম চলে গেলেন। সাবিত্রীও আবার বনের মধ্যে সেই জায়গায় ফিরে গিয়ে, অচেতন স্বামীর মাথাটি আবার কোলে তুলে নিলেন। অমনি সত্যবান চোখ মেলে চেয়ে বললেন, 'একি! সন্ধ্যা হয়ে গেছে যে। তুমি আমাকে জাগাওনি কেন? আর সেই কালো লোকটি কোথায় গেলেন।'

সাবিত্রী বললেন, 'তিনি চলে গেছেন। রাত হয়ে গেছে। সারা দিন খাওয়া-দাওয়া নেই, এখন বাড়ি চল।' উঠে বসেই সত্যবানের বড় ভাবনা, আহা মা-বাবা না জানি কতই ভাবছেন। এত দেরি তো কখনো হয় না।

তখন সাবিত্রী ফলের ঝুড়ি আর কুড়ুল তুলে নিলেন। সত্যবানের শরীর তখনো দুর্বল। স্ত্রীর কাঁধে ভর করে তিনি আশ্রমের দিকে চললেন। বনের পথ তাঁর নখ-দর্পণে, অন্ধকারে পথ চিনতে কোনো অসুবিধা হল না।

এদিকে আশ্রমে বসে দ্যুমৎসেন ভাবছেন, 'তাইতো, অন্য দিন সত্যবান এর অনেক আগেই ফিরে আসে, আজ কোনো বিপদ হয়নি তো? হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে চারদিকের দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। যমের দয়ায় তিনি দৃষ্টি ফিরে পেলেন। কিন্তু সত্যবান কেন ফিরছে না? দুর্ভাবনায় আকুল হয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বনপথে গিয়ে ছেলে বৌয়ের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। তাঁর সেই কাতর কণ্ঠ শুনে আশ্রমের অন্যান্য মুনিরা ছুটে গিয়ে, তাঁকে নানা ভাবে আশ্বাস দিতে লাগলেন।

গৌতম মুনি বললেন, 'আমি তপস্যাবলে জানতে পারছি সত্যবান বেঁচে আছে।' দালভ্য মুনি বললেন, 'তোমার চোখ যাঁর দয়ায় ভালো হয়ে গেছে, তাঁরই দয়ায় সে-ও বেঁচে আছে।'

ঠিক সেই সময় হাসিমুখে সাবিত্রী আর সত্যবান আশ্রমে এসে পৌঁছলেন। মা-বাবা আর সমস্ত মুনিরা তাঁদের দেখে আনন্দে কোলাহল

করে উঠলেন। আসল ব্যাপার কিন্তু সত্যবান নিজেও জানতেন না। দ্যুমৎসেন দেরির কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন যে শরীর খারাপ হওয়াতে তিনি গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই দেরি হয়ে গেল।

গৌতম মুনি ছিলেন সর্বজ্ঞ। তিনি বললেন, 'সত্যবান, তুমি কিছুই জান না। তোমার বাবার চোখ কি করে ভালো হল, তাও বলতে পারবে না। কিন্তু মা সাবিত্রীর কাছে কিছুই অজানা নেই। তিনিই সব কথা বলে আমাদের সুখী করবেন।'

সাবিত্রী তখন তাঁর আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা আগাগোড়া বললেন। শুনে সকলে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হলেন।

পরদিন সকালে মুনিরা সকলে আবার দ্যুমৎসেনের আশ্রমে সমবেত হয়ে আগের দিনের বিস্ময়কর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় শাল্বদেশ থেকে একদল প্রজা তাঁদের কাছে এসে বলল, 'এবার দেশে ফিরে নিজের সিংহাসন অধিকার করুন মহারাজ। মন্ত্রী আমাদের সকলের সাহায্য নিয়ে শত্রুদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের নেতা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। আপনি অন্ধ বলে তখন আমরা আপনাকে যথেষ্ট সমর্থন করিনি, সেজন্য আমাদের অনুতাপের শেষ নেই। আপনি নিজের রাজ্যে ফিরে চলুন, আমরা অন্য রাজা চাই না।'

এই কথা বলার পর তারা লক্ষ্য করল রাজা তো আর অন্ধ নেই, তাঁর দুই চোখে দৃষ্টি ফিরে এসেছে। আনন্দে অভিভূত হয়ে সকলে তাঁর পায়ে পড়ল।

প্রজারা রথ, হাতি, ঘোড়া সব-ই এনেছিল। রাজা দ্যুমৎসেন দেশে ফিরে তাঁর সিংহাসনে বসলেন। সত্যবান হলেন যুবরাজ। এরপর বাস্তবিকই রাজা অশ্বপতির আর সত্যবান-সাবিত্রীর একশোটি করে ছেলে হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধর্মমতে রাজ্য পালন করে, সময় হলে তাঁরা সকলেই পুণ্যলোকে স্থান পেলেন।

বাইবেলের গোড়ার দিকে সৃষ্টির কথা আছে। প্রথমে কিছুই ছিল না। সেই না-আলো না-অন্ধকার নেই-রাজ্যে কেবলমাত্র ঈশ্বর ছিলেন। তিনি সবার আগে আলো সৃষ্টি করলেন। তারপর একে একে জল, হাওয়া, মাটি, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ, ডাঙার জন্তু, আকাশের পাখি ইত্যাদি একেক দিনে একেক রকম প্রাণী তৈরি করে, ষষ্ঠ দিনে নিজের আকারে মানুষ সৃষ্টি করলেন। তার দেহে প্রাণবায়ু দিলেন। মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠল। সপ্তম দিনে ঈশ্বর বিশ্রাম করলেন। সৃষ্টির এই প্রাচীন কথা মনে করেই সভ্য মানুষরাও সপ্তাহে এক দিন বিশ্রাম করে। এই তো গেল বাইবেলের কথা। মহাভারতে অন্য কাহিনী আছে।

সৃষ্টির আগে ছিল শুধু অন্ধকার। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ছিল না; দেবতাও না, অসুরও না; কেউ না; কিছু না। তারপর সেই অন্ধকারের মধ্যে একটি ডিম গড়ে উঠল। সময় হলে সেই ডিম ফুটে, তার মধ্যে থেকে ব্রহ্মা বেরিয়ে এলেন। তাঁর পর অন্য দেবতা, দানব, যক্ষ, পিশাচ; তার পর জল, বাতাস, আকাশ, মাটি ক্রমে ক্রমে সবই বেরোল। ঐ ডিম থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হল। অণ্ড মানেই ডিম। তাই সৃষ্টিকে বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মার অনেক ছেলে। তাঁদের মধ্যে সাতজনকে বলা হয় সপ্তর্ষি। পরিষ্কার আকাশে সপ্তর্ষির সাতটি সুন্দর তারাকে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের নাম মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু আর বশিষ্ঠ। ব্রহ্মার বুক থেকে ধর্ম আর ভৃগু আর পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে দক্ষ জন্মান। মরীচির এক ছেলে কশ্যপ। তিনি দক্ষের তেরোটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এঁদের সন্তানরাই দেবতা, দৈত্য গন্ধর্ব অপ্সরা। দক্ষের মেয়েদের কারো সুন্দর নাম ছিল, কারো নাম বেশ মজার:—

অদিতি, দিতি, দনু, দনায়ু, ক্রোধা, প্রধা, কালা, বিনতা, কপিলা, বিশ্বা, কদ্রু, মুনি, সিংহিকা।

পুলস্ত্যর সন্তানরা ছিল রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, বানর। পুলহ ছিল বাঘ সিংহ ইত্যাদির পিতা। অন্যান্য জন্তু-জানোয়াররাও ব্রহ্মার ছেলেদের বংশধর। তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মাই ছিলেন সব প্রাণীর আদি পিতামহ। দেবতারাও নাকি তাঁকে পিতামহ বলে ডাকতেন।

মহাভারতে আছে যে সৃষ্টি সব সময় একই ভাবে থাকে না। মানুষের জীবনে যেমন শৈশবের পর কৈশোর, তারপর যৌবন, তারপর প্রবীণ বয়স, সবার শেষে বার্ধক্য ; সৃষ্টির ইতিহাসও ঠিক সেই রকম। একেক যুগের পর আরেক নতুন যুগ আসে। তখন আগেকার সব কিছুই বদলে যায়। কিন্তু আরো ভালো না হয়ে, বরং মন্দের দিকে যায়। প্রথমে ছিল সত্যযুগ। তখন সবই ছিল মহৎ আর বিশাল। মানুষ মাথায় ছিল ২১ হাত উঁচু। তার মন ছিল উদার, পবিত্র, ধর্মপরায়ণ। তারপর এল ত্রেতা যুগ। তখন মাথায় সে হল ১৪ হাত। তার মনের মধ্যেও একটু একটু দুষ্টুমি দেখা দিল। ত্রেতার পর দ্বাপর যুগ। তখন মানুষ মাত্র ৭ হাত উঁচু। আর মনে যত সুবুদ্ধি, তার সমান কুবুদ্ধি। সবার শেষে কলিযুগ এল। সে এখন ও চলেছে। মানুষ এখনও মাথায় মোটে সাড়ে তিন হাতের মতো আর মনটা কুটিলতায় ভরা। যতই দিনের পর দিন কাটতে থাকবে, মানুষের পাপের বোঝাও ততই বাড়বে। শেষটা যখন মঙ্গলের ভাগ প্রায় কিছুই বাকি থাকবে না আর মন্দের ভাগ গন্ধমাদন পর্বতের সমান উঁচু হয়ে উঠবে, তখন প্রলয়কাণ্ড হবে। সমস্ত জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু শাস্ত্রে বলে সেখানেই শেষ নয়। প্রলয়ের পর দয়াময় ঈশ্বর আবার নতুন করে সৃষ্টি করবেন। এমনি করে কতবার যে সৃষ্টি হয়েছে আর সেই সৃষ্টি ধ্বংসও হয়েছে, তার হিসাব কে রাখে ? যখন ধ্বংস হয় তখন সব-ই নষ্ট হয়। দেবতাদের যে অমর বলা হয়, তাঁরাও রেহাই পান না। তাঁদরেও আবার নতুন করে জন্ম নিতে হয়। তবে সব নিয়মের-ই ব্যতিক্রম থাকে। মার্কণ্ডেয় মুনিও সেই রকম সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়মের বাইরে। বনবাসী পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তখন তিনি নিজের মুখে অতি আশ্চর্য সব কথা বলেছিলেন। সে-সব

কথা তিনি ছাড়া আর কারো জানবার বিষয় নয়। কারণ প্রলয়ের সময় যখন সব ধ্বংস হয়ে যায়, তখন যে কি সর্বনাশ হয়, তা দেখবার কেউ থাকে না। মার্কণ্ডেয় ছাড়া আর সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়।

তিনিও যে কেন ধ্বংস হন না আর কি উপায়ে ঐ ব্যাপক সর্বনাশের হাত থেকে নিস্তার পান, তা কিন্তু জানা যায় না। মার্কণ্ড যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন তিনি যে শুধু একবার প্রলয় দেখেই ক্ষান্ত হয়েছেন, তা নয়। আবার যখন প্রলয় হবে, তা-ও তিনি দেখবেন। তিনি বিনষ্ট হবেন না। তাঁর বয়স তো অনেক হাজার বছর হবে, কিন্তু তাঁকে দেখে যুধিষ্ঠিরের মনে হল যেন নবীন যুবক।

মার্কণ্ডেয় প্রলয়ের বর্ণনা দিয়েছিলেন। সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। মুনি ধ্বংস হননি বটে, কিন্তু বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। প্রলয়ের আগে অনেক বছর ধরে অনাবৃষ্টি চলেছিল। গাছপালা শুকিয়ে গেল। দুর্বল ছোটখাটো জন্তুজানোয়াররা আগে মরে গেল। বাইবেলের শেষের দিকে প্রলয়ের বর্ণনা আছে। তখন চার রকম সর্বনাশ নাকি মানুষ আর জীবজন্তুদের বিধ্বস্ত করবে। আগুন, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, যুদ্ধবিগ্রহ। মার্কণ্ডেয়ের বিবৃতি আরো সাংঘাতিক, আরো খুঁটিয়ে বলা।

বৃষ্টির দেখা নেই। ওদিকে একটি জায়গায় সাতটি সূর্য আকাশে দেখা দিল। নদী, নালা, পুকুর, খাল, সাগর সব শুকিয়ে গেল। ঘাস, পাতা, কাঠ সব জ্বলেপুড়ে খাক্ হল।

তারপর এল সম্বর্তক নামে আগুন আর সেই সঙ্গে তুমুল ঝড়। কেউ বাঁচল না। পৃথিবীর বুকে তো নয়-ই, আকাশেও না, পাতালেও না। সম্বর্তক কাউকে বাদ দিল না। দেবতা মানুষ জীবজন্তু সব পুড়ে শেষ হলে, এল নানা রঙের মেঘ। অত বিশাল ঘন মেঘ কেউ দেখে নি। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকানি আর বাজ পড়া। আর সে কি বৃষ্টি! বারো বছর ধরে বৃষ্টি পড়ল। আগুন তো নিবে গেলই, ত্রিভুবন ডুবে গেল। বাইবেলেও এক সর্বনাশা বৃষ্টি আর বন্যার কাহিনী আছে। তাতে বলা হয়েছে সবাই ডুবে মারা গিয়েছিল, খালি নোহ নামে একজন পরম ধার্মিক মানুষ ঈশ্বরের দয়ায় তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে বেঁচে

গিয়েছিলেন। কেমন করে বেঁচেছিলেন তাও বলা আছে।

বিরাট এক জাহাজ তৈরি করে, তার ভেতরে বাইরে আলকাতরা মাখিয়ে জল-ঢোকার পথ বন্ধ করেছিলেন। ওপরে মস্ত ছাদ। সেটিতেও আলকাত্‌রা লাগানো হল। তারপর সৃষ্টির যত রকম জীবজন্তু, পাখি, পোকা, সরীসৃপ, জলচর প্রাণী, প্রত্যেকের এক জোড়া নিয়ে আর দীর্ঘকালের জন্য খাবারদাবার নিয়ে দরজা এঁটে দেবার পর দয়াময় ঈশ্বর বৃষ্টি নামালেন। তাও বারো বছর ধরে নয়। তার অনেক আগেই সবাই ডুবে মরে গেল। বৃষ্টি থামল, জল নামল। আরারাট বলে পবিত্র পাহাড়ে নৌকা এসে ডাঙা পেল।

আরো কিছুদিন পরে নোহ জানলা দিয়ে পাখি ছাড়লেন। সে পাখি ফিরে এল, বাইরে তখনো জল। পা রাখার জায়গা নেই। আরো কিছু দিন গেলে যখন পাখি ছাড়া হল, সে আর ফিরল না। নোহ বুঝলেন, তাহলে পৃথিবীর মাটি শুকিয়েছে। তখন তিনি নৌকোর দরজা ভেঙে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে এসে প্রথমেই ঈশ্বরের উপাসনা করলেন। ঈশ্বরও সাহস দিয়ে বললেন এমন সর্বনাশ আর কখনো হবে না।

এখনকার পৃথিবীর সব মানুষ ও জীবজন্তু ঐ নোহ ও তাঁর আশ্রিতদের বংশধর।

আমাদের পুরাণ কিন্তু অন্য কথা বলে। বারো বছর পরে ঐ সর্বনাশা বৃষ্টি যখন থামল, তখন চারদিকে জল ছাড়া আর কিছু ছিল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই জলে ডুবে গিয়েছিল।

এদিকে মার্কণ্ডেয় মুনির অবস্থা কাহিল। খিদের চোটে পেট জ্বলে যায়, আগুনের শিখায় মুখ ঝলসে যায়, জলে ভেসে বেড়িয়ে প্রাণ যায় আর কি! তবু তিনি মরেন নি। সেই ঘোর বিপদের সময় হঠাৎ দেখেন সামনে এক আকাশ প্রমাণ বটগাছ। সে যে যে-সে বটগাছ নয়, তা আর বলে দিতে হল না। গাছের উপর একটা খাট তোলা ছিল। খাটে চমৎকার বিছানা পাতা। সেই বিছানায় অতি সুন্দর দেখতে এক কিশোর বসে। তার গায়ের রঙ নীল।

তাকে দেখে মার্কণ্ডেয় অবাক হলেন। চারদিকের এই ধ্বংসলীলার

মাঝখানে এ ছেলে কোথা থেকে খাট বিছানা যোগাড় করে, দিব্যি সুন্দর গাছের উপর বসে আছে! এই সর্বনাশের মধ্যে সে বাঁচলই বা কি করে? মার্কণ্ডেয় পরম পণ্ডিত ছিলেন, যাকে বলে ত্রিকালজ্ঞ। অর্থাৎ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু সেই জ্ঞানরাশির মধ্যেও এই ছেলের রহস্য মুনির কাছে অজানা ছিল।

ছেলেটি তাঁকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আহা, তুমি বোধ হয় বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, মার্কণ্ডেয়? একটা কাজ করলে পার। আমার পেটের মধ্যে ঢুকে খানিকটা বিশ্রাম করে নাও।'

এই বলে সে হাঁ করল আর মার্কণ্ডেয় অনায়াসে তার পেটের মধ্যে ঢুকে গেলেন! পেটের মধ্যে গিয়ে মুনির মনে হল তিনি ঠিক এই পৃথিবীর মতো আরেকটা সুন্দর পৃথিবীতে পৌঁছে গেছেন। সেখানেও হিমালয় পাহাড়, গঙ্গা নদী, চেনা সব শহর-গ্রাম, নদ-নদী। সেই সব তীর্থস্থান, ঘরবাড়ি। তেমনি করেই লোকে হাট-বাজারে কেনাকাটা করছে, সংসার করছে। কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। সেই আশা, সেই আনন্দ।

মার্কণ্ডেয়র মন বিস্ময়ে ভরে গেল। তিনি সেই কিশোরের পেটের মধ্যে কত হাজার বছর বাস করলেন তার ঠিক নেই। সেখান থেকে বেরোবার পথ কোথাও খুঁজে পেলেন না। বাইরে কি হচ্ছে, তাও জানবার উপায় ছিল না।

এক সময় মুনির মনে হল ইনি তো যে-সে ছেলে নন। ইনি কোনো মহাপুরুষ হবেন। এই ভেবে তাঁর স্তব করতে বসলেন। অমনি দেখেন কি আশ্চর্য! তিনি যে আবার বাইরের জগতে পেঁাছে গেছেন! সেই বটগাছ। বটগাছের উপর সেই খাট বিছানা। খাটের উপরে সেই নীল রঙের কিশোর।

তাঁকে দেখেই ছেলেটি বলল,'আরামে বিশ্রাম করেছ তোমার্কণ্ডেয়?'

মার্কণ্ডেয় তখন তাঁর আসল পরিচয় পেলেন। ইনিই হলেন নারায়ণ। নারায়ণ বললেন, 'ব্রহ্মা এখন ঘুমিয়ে আছেন। যেই জেগে উঠবেন, আবার নতুন সৃষ্টি করবেন। তুমি ততক্ষণ এইখানেই বিশ্রাম কর।'

এই বলে কিশোর অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ব্রহ্মার ঘুম ভাঙলে আবার নতুন সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হল। এই সব আশ্চর্য কথা মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন।

দেবাসুরের যুগ

ব্রহ্মার ছেলে মরীচি, মরীচির ছেলে কশ্যপ। মনে থাকতে পারে ব্রহ্মার পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে দক্ষের জন্ম হয়েছিল। দক্ষের পঞ্চাশটি মেয়ে ছিল। তার মধ্যে তেরোটিকে কশ্যপ বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অদিতি আর দিতি। অদিতির বারো ছেলে—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। লোকে তাঁদের আদিত্য বলে। তাঁরা দেবতাদের বন্ধু।

দিতির ছেলে হিরণ্যকশিপু। দিতির ছেলে, তাই এঁদের বংশ হল দৈত্য বংশ। এঁরা অসুরদের দলের লোক। দেবাসুরের শত্রুতা চির-কালের ব্যাপার। অসুরদের ইচ্ছা স্বর্গ থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে তাঁরাই ভোগ-দখল করবেন। দেবতাদের মনেও সর্বদা সেই ভয়। দেবাসুরের ঝড়গা সৃষ্টির গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল।

যখন কোনো কিছু ছিল না, চারদিকে খালি জল আর জল, তখন সেই জলে অনন্ত বলে একটি সাপ এল। তার হাজারটা মাথা। সেই সাপের মাথায় শুয়ে নারায়ণ ঘুমিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম ফুটে ওঠে। সেই পদ্মে ব্রহ্মা থাকতেন। একবার নারায়ণের হাত থেকে দু ফোঁটা জল পদ্মের উপর পড়েছিল। তাই দেখে কিছু না ভেবে নারায়ণ বলেছিলেন, 'ঐ দুই ফোঁটা জল থেকে দুটো দৈত্য হোক।'

আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে সেই দু ফোঁটা জল থেকে গদা হাতে দুটো বিকট দৈত্য বেরিয়ে এল। তাদের নাম মধু আর কৈটভ। এদিকে ব্রহ্মা সৃষ্টির কাজ আরম্ভ করার আগে বেদ রচনা করতে বসেছেন। অমনি মধু কৈটভ তাঁর হাত থেকে সে পুঁথি কেড়ে নিয়ে জলে ডুব দিল। ডুব বলে ডুব! একেবারে পাতালে গিয়ে তবে থেমেছিল তারা।

এ দিকে বেদ ছাড়া ব্রহ্মা নিরুপায়! তিনি নারায়ণকে বললেন, 'এবার কি করা যায় বল। বেদ না হলে আমি কিছুই সৃষ্টি করতে পারব না।' অমনি নারায়ণের ঘুম ছুটে গেল। তিনি বিকট হয়গ্রীবের

রূপ ধরে পাতালে গেলেন। হয় মানে ঘোড়া। হয়গ্রীবের মাথাটা দেখতে ঘোড়ার মতো।

পাতালে পৌঁছে নারায়ণ জোরে জোরে সামগান করতে লাগলেন। তাই শুনে মধু কৈটভ দেখতে চলল কে অমন শব্দ করছে। বেদ সেই-খানেই পড়ে রইল। অমনি নারায়ণও সেটি তুলে নিয়ে, হয়গ্রীবের চেহারা ছেড়ে, নিজের রূপে ব্রহ্মার কাছে ফিরে গিয়ে, তাঁকে বেদ দিয়ে, আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

ওদিকে মধু কৈটভ পাতাল তোলপাড় করেও কে ঐ শব্দ করছিল বুঝতে পারল না। শেষে হতাশ হয়ে ফিরে এসে দেখে এর মধ্যে কেউ এসে বেদ নিয়ে সরে পড়েছে! তখন তাদের রাগ দেখে কে। তখুনি তারা পাতাল থেকে আবার উঠে এল। উঠে দেখে সেই ফরসা লোকটা তখনো ঘুমোচ্ছে! তাকে দেখেই ওদের রাগ বেড়ে গেল, 'দেখেছ, ব্যাটা এখনো ঘুমোচ্ছে! ও-ই চোর না হয়ে যায় না!'

এই বলে তাঁর দিকে মুগুর হাতে তারা তেড়ে এল। হট্টগোল শুনে নারায়ণের ঘুম ভেঙে গেল। তিনিও যুদ্ধে নামলেন। তাঁর সঙ্গে তারা পারবে কেন? দেখতে দেখতে তাদের প্রাণও বেরিয়ে গেল। সবচেয়ে মজা হচ্ছে যে, দু ফোঁটা জল থেকে নারায়ণ নিজেই আপদ দুটোকে তৈরি করেছিলেন। বারে বারে দেখা যায় যে দেবতারা বড়ই ভালো মানুষ ছিলেন। কত জনে কত মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে তপস্যা করে তাঁদের খুশি করে, নানা রকম বর চেয়ে নিত। তার ফলে তাঁদের হয়রানির শেষ থাকত না, যেমন সুন্দ আর উপসুন্দকে নিয়ে হয়েছিল।

এরা দু জন ছিল হিরণ্যকশিপুর বংশধর। তাদের বড় বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ত্রিভুবন জয় করতে হবে। অর্থাৎ তারা স্বর্গমর্ত-পাতালের অধীশ্বর হতে চায়! সে তো খুব সহজ কাজ নয়, কিন্তু তাতে তারা দমে গেল না। বড় কিছু পেতে হলে, বেশি কষ্ট তো করতেই হবে।

সুন্দ উপসুন্দ বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে অতি ভয়ঙ্কর তপস্যা আরম্ভ করল। তাই দেখে দেবতাদের বড় ভয় হল। কি জানি শেষটা যদি ব্রহ্মার কাছ থেকে এমন কিছু আদায় করে বসে, যার প্রভাবে তাঁদের স্বর্গছাড়া

করতে পারে! এদের কিছুই বলা যায় না। কাজেই নানা উপায়ে তাঁরা তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তারা পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে, চোখের পলক না ফেলে, শুধুমাত্র বাতাস খেয়ে, তপস্যায় রত থাকলেন। সে তপস্যার এমনি তেজ যে বিন্ধ্যপাহাড়ের গাছে আগুন ধরে গেল। তাই দেখে ব্রহ্মা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাদের সামনে দেখা দিয়ে বললেন, 'কি বর চাও, বল।'

তারা বলল, 'আমরা এই বর চাই আমরা যেন সবরকম মায়া জানতে পারি। আমরা যেন ইচ্ছামতো নিজেদের চেহারা বদল করতে পারি। আমরা যেন যুদ্ধে সর্বদা জয়ী হই। তাছাড়া আমরা অমর হতে চাই।'

এত দাবি শুনে ব্রহ্মা নিশ্চয়ই একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আপত্তি জানিয়েছিলেন শুধু শেষ ইচ্ছাটাতে। তিনি বললেন, 'শেষেরটা ছাড়া সব কটি বর দিলাম। এদিকে ত্রিভূবন জয় করার জন্য তপস্যা করছ, ওদিকে অমর হতে চাও! তাহলে দেবতাদের কি অবস্থা হবে? অমর হওয়া তোমাদের হবে না।'

সুন্দ উপসুন্দ-ও তাঁকে সহজে ছাড়ল না। তারা বলল, 'তাহলে অন্ততঃ এই বর দিন যে ত্রিভুবনের কেউ আমাদের মারতে পারবে না। আমরা নিজেরা ছাড়া কেউই আমাদের মারতে পারবে না।'

ব্রহ্মা বললেন, 'তথাস্তু। তাই হবে। তোমাদের নিজেদের হাতেই তোমরা মরবে।' এই বলে তিনি চলে গেলেন। এদিকে সুন্দ উপসুন্দর ফুর্তি দেখে কে! বিরাট একদল বিকটাকার দৈত্য নিয়ে তারা ত্রিভূবন জয় করতে বেরোল।

ব্রহ্মার বরের কথা দেবতাদের কানেও গিয়েছিল। কাজেই অসুরদের দূর থেকে দেখতে পেয়েই, স্বর্গ ছেড়ে তাঁরা সব ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হলেন। অসুররাও স্বর্গ শূন্য দেখে, সেখানে দখল নিল। যে ক জন ছিল তাদের সবাইকে মেরে ফেলল।

সুন্দ উপসুন্দ স্বর্গ অধিকার করেই থামল না। তারা বলল রাজারা

আর মুনিরাই তো পূজো আরাধনা করে দেবতাদের তেজ বাড়িয়ে দেয়। কাজেই তাদের আগে মেরে ফেলা দরকার। যেমন বলা, তেমনি কাজ। দলে দলে অসুররা মুনিদের আশ্রমে হানা দিয়ে তাঁদের পূজোর জিনিস নষ্ট করে, তাঁদের হত্যা করে এক কাণ্ড বাধাল। ব্রহ্মা নিজে তাদের বর দিয়েছেন, মুনিদের শাপ তাদের গায়ে লাগল না। তখন মুনিরা হার মেনে, পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। রাজাদের অবস্থাও এর থেকে একটুও ভালো নয়।

সুন্দ উপসুন্দর অত্যাচারে সমস্ত পৃথিবী ছারখার হয়ে যেতে লাগল। পৃথিবী থেকে সব আনন্দ ঘুচে গেল। চারদিকে খালি কান্না আর হাহাকার। ধর্মকর্ম, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, শিক্ষাদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষ-বাস সবই প্রায় বন্ধ হল। সুন্দ-উপসুন্দের লজ্জাও নেই, দয়াও নেই। জগৎ রসাতলে যাচ্ছে আর তারা দিব্যি সুন্দর কুরুক্ষেত্রে গিয়ে বাস করছে!

এদিকে দেবর্ষি আর সিদ্ধপুরুষরা অন্য কোনো উপায় না দেখে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'পিতামহ, আপনি জগৎকে উদ্ধার না করলে কে করবে?' ব্রহ্মা খানিক ভেবে বিশ্বকর্মাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'আমার জন্যে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে গড়ে দাও, যার মতো সুন্দরী কেউ কখনো দেখেনি।'

বিশ্বকর্মাও তখনি কাজে লেগে গেলেন। কাজটা খুব সহজ নয়। ত্রিভুবনে যেখানে যা কিছু সুন্দর, তার সবচেয়ে সুন্দর অংশগুলি একে একে তিনি জড়ো করলেন। চাঁদের আলো, রামধনুর রঙ, ফুলের শোভা, মনিমুক্তোর জ্যোতি, গানের সুর, নাচের লাবণ্য, হাসির মাধুরী। তিল তিল করে এই সমস্ত সৌন্দর্যের উপাদান জড়ো করে যে রূপসী কন্যা তৈরি করলেন, তার নাম হল তিলোত্তমা। তিলোত্তমাকে যে দেখে, সে আর চোখ ফেরাতে পারে না। তাকে দেখবার জন্য ইন্দ্রের দুই চোখের জায়গায় হাজার চোখ হল। মহাদেবের এক মুখের জায়গায় চারটি মুখ হল।

তিলোত্তমা সেদিকে না তাকিয়ে, ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বলল,

'ভগবন্, আপনি আমাকে যা করতে বলবেন, আমি তাই করব।'

ব্রহ্মা বললেন, 'বাছা, সুন্দ উপসুন্দ যেখানেই থাকুক, তাদের সামনে গিয়ে একবার দেখা দাও। আর কিছু করতে হবে না।'

তিলোত্তমা তখন সব দেবতাকে প্রণাম করে বিন্ধ্যপর্বতে গেল। সেখানে সুন্দ উপসুন্দ বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে অবাক হয়ে তারা দেখল লাল কাপড় পরে একটি মেয়ে বনের ফুল তুলছে। এমন সুন্দর মেয়ে যে হয়, এ তাদের কল্পনার বাইরে ছিল।

যখন তাদের মুখে ভাষা ফিরে এল, দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'এই মেয়েকে আমি বিয়ে করব।' তা, দুজনে তো আর তাকে বিয়ে করতে পারে না, কাজেই ঝগড়া বেঁধে গেল। এ বলে 'তোর তো কম আস্পর্ধা নয়! আমি আগে দেখেছি, আমি ওকে বিয়ে করব।' ও বলে, 'মিথ্যেবাদী কোথাকার, আমি আগে দেখেছি।' 'চোপ, বেয়াদব!' 'মুখ সামলে কথা বলিস্।'

ক্রমে দুজনে আরো গরম হয়ে উঠল। তর্কাতর্কি থেকে গালাগালি। গালাগালি থেকে হাতাহাতি হতে কতক্ষণ লাগে! শেষ পর্যন্ত গদা হাতে দুজনে দুজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল! গদার মোক্ষম মার হল মাথায়। কাজেই দেখতে দেখতে দুজনার গদার ঘায়ে দুজনেরই খুলি ফেটে গেল। দুজনের-ই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হল। ব্রহ্মার বর ফলল। জগৎ শান্ত হল।

সুন্দ উপসুন্দর দলের লোক যারা ছিল, তারা দুই দলপতির পরিণাম দেখে সেই চোঁচা দৌড় দিল, আর কখনো ওমুখো হল না। একেবারে পাতালে পৌঁছে তবে তারা থামল।

তিলোত্তমা দেবতাদের কাছে ফিরে গিয়ে সব কথা বলতেই, তাঁরা তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। তারপর সূর্য যে পথে আকাশ পার হন, সেইখানে তাঁরা তিলোত্তমাকে রেখে এলেন। এত রূপ তো আর এ পৃথিবীর জিনিস নয়। এখনো সে সূর্যের চলার পথেই খেলা করে, কিন্তু সূর্যদেবের চোখ ঝলসানো আলোর জন্য মানুষ তাকে দেখতে পায় না।

সৃষ্টির প্রথম দিকে দেবতা বা অসুর কেউই অমর ছিলেন না। কাজেই তাঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় পরস্পরকে মেরে ফেলতে পারতেন। মুশকিল হল যে অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য মৃত সঞ্জীবনীর নাম জানতেন আর দেবগুরু বৃহস্পতি ঐ মন্ত্র জানতেন না। ফলে যুদ্ধে নিহত অসুরদের শক্র আবার বাঁচিয়ে দিতেন, কিন্তু দেবতাদের সে উপায় ছিল না। এমনিতেই অসুরদের গায়ের জোর বেশি ছিল, তার ওপর এই সুবিধা! দেবতারা মহা সমস্যায় পড়লেন। ঐ সঞ্জীবনী মন্ত্রটি যে করেই হোক তাঁদের জানা দরকার।

শুক্রের সঙ্গে দেবতাদের কোনো ঝগড়া ছিল না। তাঁর কাছে গিয়ে কেউ যদি মন্ত্রটি শিখে আসতে পারে, তবেই ল্যাঠা চোকে। কিন্তু কে যাবে? শেষ পর্যন্ত পরামর্শ করে দেবতারা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এ কাজের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির বড় ছেলে কচের চেয়ে উপযুক্ত কেউ নেই। তাঁকেই এই কঠিন কাজটি করতে বলা হোক।

যেমন তেমন দেবতা ছিলেন না শুক্র। ব্রহ্মার বুক থেকে ধর্মের সঙ্গে ভৃগুর জন্ম হয়েছিল। সেই ভৃগুর পুত্র শুক্র। জ্ঞানে বুদ্ধিতে মহত্ত্বে তিনি অদ্বিতীয়। কচ তাতে ভয় পেলেন না। বংশগৌরব তাঁরও কম নয়। অঙ্গিরা হলেন সপ্তর্ষিদের একজন। তাঁর ছেলে বৃহস্পতি। বৃহস্পতির ছেলে কচ। তিনি নির্ভয়ে শুক্রাচার্যের সঙ্গে দেখা করবার জন্য যাত্রা করলেন।

দানবদের রাজার নাম বৃষপর্বা। তাঁর বাড়িতেই শুক্র থাকতেন। কচ যখন সেখানে পৌঁছলেন, গুরু সে সময়ে রাজার কাছে বসে ছিলেন। কচ নিজের পরিচয় দিতেই, মহাপ্রাণ শুক্র তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

কচ তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু, আমি আপনার শিষ্য হতে চাই। এক হাজার বছর আপনার কাছে কাছে থেকে আপনার সেবা

করতে চাই। আপনি আমাকে যে শিক্ষা দেবেন তাই লাভ করে কৃতার্থ হতে চাই।' এমন মধুর কথা শুনে শুক্র মুগ্ধ হলেন। আনন্দিত চিত্তে তিনি কচকে শিষ্যত্বে বরণ করলেন। সেদিক থেকে কচ শুক্রের পরিবারের একজন হয়ে গেলেন। সর্বদা গুরুর কথা মেনে চলতেন, তাঁর আদেশের অপেক্ষা করে থাকতেন। গুরু-কন্যা দেবযানীর জন্য তিনি ফুল তুলে দিতেন ; তাঁর সব কাজে সাহায্য করতেন ; গান গাইতেন ; নাচ দেখিয়ে তাঁকে খুশি করতেন। অন্য সময় গুরুর কাছে বিদ্যা সাধনায় কেটে যেত।

এই ভাবে পাঁচশো বছর কেটে গেল। কচ শুক্রের প্রিয় শিষ্য হওয়াতে দানবরা কিন্তু খুশি হয়নি। তাদের বড় ভয় বিদ্যা সাধনার ছল করে কচ সঞ্জীবনী মন্ত্রটিকেও না শিখে ফেলেন। তাহলে তো দেবতাদের আর ঠেকানো যাবে না। দানবরা গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগল, কচকে কি করে হত্যা করা যায়।

কচ বনে গিয়ে গুরুর গরু চরাতেন। দানবরা সেখানে গিয়ে, তাঁকে টুকরো টুকরো করে কেটে, টুকরোগুলো শেয়াল-কুকুর দিয়ে খাইয়ে, যে যার চলে গেল। সন্ধ্যার সময় গরুগুলো নিজেরাই ফিরে এল। সঙ্গে কচ নেই। দেবযানী তাঁকে বড়ই ভালবাসতেন। কচ এল না দেখে, তাঁর মনে বড় ভয় হল। এমন তো কখনো হয় না।

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে, দেবযানী বাপের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন, 'বাবা, আমার মন বলছে কচ বেঁচে নেই। তিনি না বাঁচলে, আমিও বাঁচব না। কত দেরি হল, সন্ধ্যাহুতি হয়ে গেল, গরুরা একা ফিরল!'

শুক্রাচার্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ভেবো না মা, আমি তাকে মন্ত্রবলে এনে দিচ্ছি!' এই বলে তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়তে পড়তে কচের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। অমনি শেয়াল-কুকুরদের পেট ফুঁড়ে, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে কচ তাঁর গুরুর কাছে পৌঁছলেন। দেবযানী জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেরি হল কেন?' তিনি বললেন, 'ক্লান্ত হয়ে গাছতলায় বিশ্রাম করছিলাম, দানবরা এসে আমার পরিচয় জানতে চাইল।

পরিচয় শুনেই তারা আমাকে কেটে ফেলে, শেয়াল-কুকুরকে খাইয়ে দিল। গুরুদেব আমাকে সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে আবার বাঁচিয়ে দিলেন। আমিও চলে এলাম।'

আরেকবার কচ বনে দেবযানীর জন্য ফুল তুলছেন, এমন সময় অসুররা এসে তাঁকে হত্যা করে, তাঁর দেহটাকে পুড়িয়ে, ছাইগুলো নিয়ে শুক্রাচার্যের পানীয় সুরার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ভাবল, এবার গুরুদেব কেমন করে ব্যাটাকে বাঁচিয়ে দেন দেখা যাবে। বাস্তবিক-ই নেশার ঝোঁকে শুক্র টেরও পেলেন না সুরার সঙ্গে অন্য কিছু মেশানো আছে। নিশ্চিন্ত মনে সুরা পান করলেন।

সেদিনও কচ ফিরছেন না দেখে দেবযানী কান্নাকাটি করতে লাগলেন। বারবার একই রকম ঘটনা দেখে শুক্রর বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। তার উপর তখনো তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তিনি বললেন, 'একটা সামান্য লোকের জন্য অত দুঃখ করতে হয় না, মা। ওকে বাঁচিয়ে লাভ নেই। দানবরা আবার কোন উপায়ে ওকে মেরে ফেলবে।'

দেবযানী বললেন, 'মহামুনি অঙ্গিরার নাতি, বৃহস্পতির ছেলে, নিজেও এত বিদ্বান আর ধার্মিক। তাঁকে তুমি সামান্য লোক বলতে পার না, বাবা। তাঁকে আমি বড়ই ভালবাসি। তিনি মারা গেলে আমিও বাঁচব না।'

তখন শুক্রাচার্যের স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে এল। তিনি অত্যন্ত রাগ করে বললেন, 'বারে বারে আমার শিষ্যের প্রাণহানি করে। এই অসুরদের বড় বাড় বেড়েছে। তাদের একটু উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।' এই বলে সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ে কচকে ডাকতে লাগলেন।

কয়েকবার ডাকবার পর গুরুর মনে হল কচ যেন তাঁর পেটের ভিতর থেকে উত্তর দিচ্ছেন। তাতে গুরু মহা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ও কি! তুমি আমার পেটের মধ্যে গেলে কি করে?'

কচ বললেন, 'অসুররা আমাকে মেরে আমার শরীরটা পুড়িয়ে, ছাইগুলো আপনার সুরার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। আপনিও না জেনে

সেই সুরা পান করেছেন।' তাই শুনে শুক্রের চক্ষুস্থির! এখন কি করা যায়? একে বের করতে হলে, তাঁর পেট ছিঁড়ে ফেলতে হয়। তাহলে কচ বাঁচলেও গুরুর নির্ঘাৎ মৃত্যু হবে।

সব শুনে দেবযানী বললেন, 'বাবু, তিনি গেলেও আমি যেমন বাঁচব না, তুমি মারা গেলেও আমি মরে যাব। যা ভালো মনে হয়, তাই কর। আমি আর কিছু বলব না।'

অসাধারণ বিচারবুদ্ধি ছিল শুক্রের। খানিক চিন্তা করে তিনি কচকে বললেন, 'দেখ বাছা, আমি তোমাকে এখনি সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমার পেট থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি মরে যাব। তখন তুমি ঐ সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে আমাকে বাঁচিও।'

এরপর শুক্রাচার্য যত্ন করে কচকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। এই মন্ত্র শিখবার জন্যেই কচ শুক্রের কাছে এসেছিলেন। এখন এই অভাবনীয় পরিস্থিতিতে মন্ত্রটি শিখলেন। তারপর কচ বেরিয়ে আসতেই শুক্রও মারা গেলেন। কচ তখন তাঁকে আবার জীবন দিলেন।

নতুন জীবন পেয়ে শুক্রের মনে অন্য চিন্তা এল। তিনি বললেন, 'এই সুরাপানের জন্যেই আমি আজ এমন অঘটন ঘটালাম। এই সুরা বড় জঘন্য জিনিস। যে ব্রাহ্মণ সুরা পান করবে, তার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হবে।'

শেষে তাঁর দানব-শিষ্যদের ডেকে শুক্র তাদের এমনি বকলেন যে তারা আর কখনো কচের কোনো অনিষ্ট করার চেষ্টা করে নি।

দেখতে দেখতে হাজার বছর কেটে গেল। কচ শুক্রাচার্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করছেন, এমন সময় দেবযানী এসে তাঁকে বললেন, 'তুমি আমাকে বিয়ে করে, সঙ্গে নিয়ে যাও।'

কচ অবাক হলেন। এ কথা তাঁর কখনো মনেও আসেনি। দেবযানীকে তিনি বড় বোনের মতোই ভক্তি করতেন। তিনি বললেন, 'দিদি, তোমার বাবা আমার গুরুদেব। কাজেই আমি তোমার ভাইয়ের মতো। তুমি যা বললে তা হতে পারে না।'

দেবযানীর মনে বড় আশা ছিল। সেই আশা ভেঙে যাওয়াতে,

মনের দুঃখে তিনি কচকে অভিশাপ দিলেন, 'তুমি যেমন আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ, আমিও তোমাকে শাপ দিচ্ছি, সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখেছ বটে, কিন্তু তুমি কোনো ফল পাবে না।'

কচ বললেন, 'তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি ফল না পেলেও, যাদের এ বিদ্যা শিখিয়ে দেব, তারা ফল পাবে। আর আমিও তোমাকে বলে গেলাম যে, কোনো ঋষির ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না।'

এই বলে কচ বিদায় নিয়ে স্বস্থানে ফিরে এলেন। তাঁকে ফিরে পেয়ে দেবতারা বড়ই আনন্দিত হলেন। সঞ্জীবনী বিদ্যাও যে তাঁদের অনেক কাজে লেগেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। তবুও তাঁরা সম্পূর্ণ সুখী হতে পারেননি। তাঁদের কেবলই মনে হতে লাগল যে একজন মারা গেলে আরেকজন এসে মন্ত্র পড়ে তাঁকে বাঁচাবে, এ অবস্থায় অনেক অসুবিধাও আছে। এর চেয়ে অনেক ভালো হত দেবতারা যদি আদৌ না মরতেন। অর্থাৎ যদি অমর হতেন। কিন্তু তার জন্যে অমৃত পান করা দরকার। তখন থেকেই দেবতাদের মনে কেবলই এই চিন্তা হত, কি করে অমৃত পাওয়া যায়।

শর্মিষ্ঠা আর দেবযানীর কথা

মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে কচ তো চলে গেলেন। দেবযানীর দুঃখের আর শেষ রইল না। অবশেষে কচের শেষ কথাও আশ্চর্যভাবে ফলেছিল। বৃষপর্বার মেয়ের নাম ছিল শর্মিষ্ঠা। একদিন শর্মিষ্ঠা আর দেবযানী মেয়েদের সঙ্গে বনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বনের মধ্যে পুকুর, কি সুন্দর স্নিগ্ধ তার জল। মেয়েরা স্নানের জন্য কাপড়চোপড় নিয়ে গিয়েছিল। পুকুরপাড়ে সেগুলোকে গুছিয়ে রেখে, তারা জলে নামল। এমন সময়, এক দমকা দুরন্ত বাতাস এসে সব গুছানো কাপড় উলট পালট লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। মেয়েরা এতই আমোদ করে স্নান করছিল, সাঁতার কাটছিল, এ ওর গায়ে জল ছিটোচ্ছিল যে কেউ অতটা খেয়ালই

করল না।

তারপর স্নানের শেষে, গা মুছে শুকনো কাপড় পরতে গিয়ে দেখে কাপড়গুলি যেভাবে রেখে গিয়েছিল, সেভাবে নেই। কোন্‌টা কার কাপড় গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। শর্মিষ্ঠা ভুল করে দেবযানীর কাপড়খানা হাতে করে তুলে নিয়েছিলেন। তাতে দেবযানীর রাগ দেখে কে! তাঁর বাপের পাণ্ডিত্য আর গৌরব নিয়ে তাঁর ভারি গর্ব। তিনি শর্মিষ্ঠাকে বললেন, 'তুই অসুরের মেয়ে হয়ে, আমার কাপড় ছুঁলি কোন্ সাহসে?

এ কথায় শর্মিষ্ঠার রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। হাজার হোক তিনি রাজার মেয়ে। তিনি রেগে বললেন, 'তোর অত গর্ব কিসের শুনি? তোর বাবা তো আমার বাবার চেয়ে নিচু আসনে বসে, তাঁর স্তব করে। তুই কি গলার জোরে আমার চেয়ে উঁচু হতে চাস?'

এরপর যা অবশ্যম্ভাবী, তাই হল। বকাবকি থেকে হাতাহাতি। দেবযানী কাপড়খানায় এক টান দিলেন আর শর্মিষ্ঠাও রাগের মাথায় ধাক্কা দিয়ে তাঁকে পাশের একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন। দিয়েই বড় ভয় হল। যদি সে মরে গিয়ে থাকে! দলবল নিয়ে শর্মিষ্ঠা সেখান থেকে চলে গেলেন। কুয়োয় পড়ে দেবযানী রাগে, ভয়ে, দুঃখে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

ভাগ্যের কথা কিছুই বলা যায় না। ঠিক ঐ সময় নহুষের ছেলে মহারাজ যযাতি ঘোড়ায় করে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শিকারে বেরিয়েছিলেন, সারা সকাল হরিণের পিছনে ছুটে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, পিপাসায় ছাতি ফাটে। জল খুঁজতে খুঁজতে ঐ কুয়োটি তাঁর চোখে পড়ল।

কাছে যেতেই কুয়োর ভিতর থেকে কান্না শুনতে পেলেন। রাজা খুবই আশ্চর্য হয়ে কুয়োর মধ্যে ঝুঁকে দেখলেন। কুয়োতে একজন পরমাসুন্দরী মেয়ে আকুলভাবে কাঁদছে। তাকে উপরে তুলে আনতে তাঁর খুব বেশি সময় লাগল না। পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন তিনি শুক্রাচার্যের কন্যা, নাম দেবযানী। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজা বিদায় নিলেন। এদিকে দেবযানীর দাসী ঘুর্ণিকা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে

পৌঁছল। কাঁদতে কাঁদতে দেবযানী তাকে সব কথা বললেন। আরো বললেন যে এমন ব্যবহারের পর তিনি আর রাজবাড়িতে ফিরে যাবেন না।

ঘূর্ণিকার তো চক্ষুস্থির! অমনি ছুটে শুক্রাচার্যকে সমস্ত ব্যাপারটা জানাল। শুক্রাচার্যও তখনি মেয়ের কাছে চলে এলেন। তাঁকে দেখেই দেবযানীর দুঃখ দ্বিগুণ হল। তিনি বললেন, 'বাবা, শর্মিষ্ঠা আমাকে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিল আর বলেছিল তুমি নাকি নিচু আসনে বসে তার বাবার স্তব কর! এ কি সত্যি? সত্যি হলে আমি দোষ স্বীকার করব, কিন্তু মিথ্যা হলে ওকে সাজা পেতে হবে।'

শুক্রাচার্য কত বোঝালেন, কিন্তু দেবযানীর রাগ পড়ল না। তখন তিনি বৃষপর্বার কাছে গিয়ে বললেন, 'রাজা, তুমি আমার শিষ্য কচকে তোমার লোক দিয়ে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছ। তোমার মেয়ে শর্মিষ্ঠা আমার মেয়েকে ঠেলে কুয়োয় ফেলে চলে এসেছে। আর আমি সইতে পারছি না। মেয়েকে নিয়ে চললাম।'

বৃষপর্বা চোখে অন্ধকার দেখলেন। ব্যগ্রভাবে বললেন, 'গুরুদেব, আপনি আমাদের ত্যাগ করে গেলে, আমিও সমুদ্রে ডুবে মরব।'

শুক্র বললেন, 'তুমি যেমন ভালো বুঝবে, সেই রকম করবে। কিন্তু শর্মিষ্ঠা আজ দেবযানীকে যে অপমান করেছে, সেটা ক্ষমা করা যায় না।'

বৃষপর্বা বললেন, 'গুরুদেব, আমার যা আছে, সব আপনার। আপনি আমাদের প্রভু, আমাদের উপর দয়া করুন।'

এ-কথা শুক্র দেবযানীকে জানালেন। তখন তিনি বললেন, 'রাজার মুখে এ-কথা শুনলে তবে আমার বিশ্বাস হবে।' বৃষপর্বা তখন দেবযানীকে বললেন, 'তুমি কি ইচ্ছা কর, তা বল। সে যত কঠিন কাজই হোক, আমি তাই করব।'

দেবযানী বললেন, 'তাহলে এক হাজার অসুর-কন্যা নিয়ে শর্মিষ্ঠা আমার দাসীগিরি করুক। আমার বিয়ে হলেও, তারা আমার দাসী হয়ে সঙ্গে যাবে।'

বৃষপর্বা এ-কথা শুনে শর্মিষ্ঠাকে ডেকে পাঠালেন। দাসীর মুখে সব কথা শুনে, শর্মিষ্ঠা বললেন, 'আমার ব্যবহারের জন্য শুক্রাচার্য আর

দেবযানী চলে যাবেন তা তো হতে পারে না। বেশ,আমি তার দাসীই হব।

তারপর এক হাজার সখী সঙ্গে নিয়ে দেবযানী গিয়ে শর্মিষ্ঠাকে বললেন, 'আমরা তোমার দাসী হলাম। তুমি যখন স্বামীর ঘরে যাবে, আমাদেরও নিয়ে যেও।'

দেবযানী অবাক হলেন, 'তুমি রাজার মেয়ে হয়েও আমার দাসী হবে কি করে ?'

শর্মিষ্ঠা বললেন, 'আমি তোমার দাসী হলে যদি আমার আপন-জনদের বিপদ দূর হয়, তাহলে আমি তাই হব।' সেই দিন থেকে শর্মিষ্ঠা দাসীর মতো দেবযানীর সেবা করতে লাগলেন। যাতে দানবরা সুখে থাকে, এই তাঁর একমাত্র ইচ্ছা। দেবযানী কোথাও গেলে, এক হাজার সখী নিয়ে শর্মিষ্ঠাও সঙ্গে যেতেন। দেবযানী শুলে শর্মিষ্ঠা তাঁর পা টিপে দিতেন।

আবার একদিন দেবযানী সেই বনে বেড়াতে গেলেন। এক হাজার সখী নিয়ে শর্মিষ্ঠাও সঙ্গে গেলেন। এমন-ই হল, সেদিনও রাজা যযাতি ঐ বনে শিকার করতে এলেন। দেবযানীকে প্রথমে তিনি চিনতে পারেননি। কোথায় সেই দুঃখিনী মেয়ে আর কোথায় এই বিলাসী কন্যা হাজার দাসীর সেবা নিচ্ছে ! কিন্তু দেবযানী তাঁকে ঠিকই চিনেছিলেন। সেদিনের বিপদ থেকে যিনি তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁকে কি ভোলা যায় ? সেদিন থেকেই তিনি রাজাকে ভালোবেসেছিলেন। তাঁকে দেখে যযাতিরও ভারি পছন্দ হয়েছিল।

ঐ সময় ঐখানে শুক্রাচার্য এসেছিলেন। তিনি সমস্ত অবস্থাটি বুঝে যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিয়ের অনুমতি দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে বিয়েও হয়ে গেল। যযাতি পরম আনন্দে তাঁকে নিয়ে দেশে ফিরলেন। বলা বাহুল্য শর্মিষ্ঠা তার এক হাজার সখী নিয়ে সঙ্গে গেলেন। যাত্রাকালে শুক্র যযাতিকে সাবধান করে দিলেন, 'মনে থাকে যেন, শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে তুমি বিয়ে করবে না।'

রাজধানীতে পৌঁছে যযাতির সঙ্গে দেবযানী চমৎকার প্রাসাদে রইলেন। কিন্তু সেখানে শর্মিষ্ঠাকে থাকতে দিলেন না। তাঁর জন্যে

অশোকবনে একটি বাড়ি তৈরি করা হল। তিনি সেখানে রইলেন। সেকালে একটা নিয়ম ছিল, স্ত্রীর সঙ্গে যে-সব সখীরা আসতেন, রাজা তাঁদেরো বিয়ে করতেন। তবে দেবযানীর ভারি আত্মসম্মান; ভারি অভিমানী সে। তাই যযাতি গোপনে শর্মিষ্ঠাকে বিয়ে করলেন। দেবযানী জানতে পারলেন না। শুধু দেবযানী নয়, রাজার বনের মধ্যে যাঁরা বাস করবেন; বাইরের লোকরাও তাঁদের কথা জানতে পারবে না, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।

সময় কেটে যেতে লাগল। দেবযানীর দুটি ছেলে হল, যদু আর তুর্বসু। ভারি চমৎকার তাঁদের চেহারা আর চলাফেরা। রাজধানীতে তাঁরা মাথা তুলে আনন্দের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। সকলেই তাঁদের সম্মান দেয়।

এদিকে বনের মধ্যে শর্মিষ্ঠার কোলেও তিনটি সোনার চাঁদ ছেলে এসেছে। তাদের নাম দ্রুহ্যু, অনু আর পুরু। তাঁরা বনের মধ্যেই থাকে, কেউ তাদের কথা জানে না। কোনো বিলাসিতা নেই তাদের জীবনে, সঙ্গে কোনো দাস-দাসী থাকে না। নিজেদের মনে তিনটিতে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে দেবযানী এক দিন রাজার সঙ্গে বনের মধ্যে বেড়াতে গেলেন। সেখানে দেখেন তিনটি অচেনা ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে লোকজন, রথ ঘোড়া কিছু নেই বটে, কিন্তু রাজপুত্রের মতো তাদের রূপ। দেবযানী অবাক হলেন। সঙ্গে আরো যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও ভেবে পেলেন না এরা কারা।

দেবযানী তাদের কাছে ডেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। এ কথায় তারা আনন্দের সঙ্গে যযাতিকে দেখিয়ে দিল, 'ঐ তো আমাদের বাবা। মায়ের নাম শর্মিষ্ঠা। আমাদের নাম দ্রহ্যু, অনু আর পুরু।' বাপের কাছে অন্য দিনের মতো আদর পাবার আশায় তারা যযাতির কাছে ছুটে এল। দুঃখের বিষয়, পাছে দেবযানী রাগ করেন, এই ভয়ে যযাতি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ছেলেরা দুঃখে অভিমানে কেঁদেকেটে মায়ের কাছে ফিরে গেল।

এতদিন ধরে যে-কথা যযাতি গোপন রেখেছিলেন, এবার সকলেই

তা জানল। নিদারুণ দুঃখে দেবযানীর বুক ফেটে যাচ্ছিল। তিনি রাগও দেখালেন না, ঝগড়াও করলেন না। জলভরা সুন্দর দুই চোখে রাজার দিকে চেয়ে খালি বললেন, 'মহারাজ, এই আমি গেলাম। দেবযানী বাপের বাড়িতে ফিরে গেলেন। ছেলেরা রইল।

যযাতি দেবযানীকে সত্যিই ভালোবাসতেন। তিনিও তাঁর পিছন পিছন শুক্রাচার্যের কাছে উপস্থিত হয়ে, দুই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সব কথা শুনে শুক্রের মনে যে কি হল, তা বোঝাই যায়। তিনি যা ভয় করেছিলেন, ঠিক তাই হল। রাগে, দুঃখে, রাজাকে তিনি অভিশাপ দিলেন, 'মহারাজ, তোমার ধার্মিক বলে নাম আছে, এই কি তার প্রমাণ? আমি শাপ দিচ্ছি এই মুহূর্তে তুমি থুত্থুড়ে বুড়োর মতো হয়ে যাও।'

সঙ্গে সঙ্গে যযাতির সেই উজ্জ্বল রূপ যৌবন দূর হল। তার বদলে তাঁর চুল হল শণের গুছি; দাঁত গেল পড়ে; দু-গাল গেল তুবড়িয়ে; চোখে ভালো দেখেন না; কানে ভালো শোনেন না; সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না; হাতে-পায়ে জোর নেই। যযাতি তখন নিজের দোষ স্বীকার করেও শুক্রাচার্যের কছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। বললেন, 'এ ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। এখনো আমার বয়স বেশি হয়নি; কত শখ সাধ বাকি রয়েছে। দয়া করে আমাকে আগের মতো করে দিন।'

কিন্তু শুক্রাচার্যের মন ভিজল না। তিনি বললেন, 'আমি একবার যা বলেছি, তার নড়চড় হবার উপায় নেই। তবে আর কেউ যদি তোমার জরার ভার নিজের দেহে নিয়ে, তোমাকে তার যৌবন দেয়, তাহলে আমার আপত্তি নেই।'

তখন রাজা বললেন, 'তাহলে এইটুকু অনুমতিও দিন যেন আমার পাঁচ ছেলের মধ্যে যে আমার জরাভার নিয়ে আমাকে তার যৌবন দেব, আমার পর সে-ই রাজা হবে।'

শুক্রাচার্য অনুমতি দিলেন। জরায় ভেঙে পড়া শরীর নিয়ে যযাতি দেশে ফিরে এলেন। এসে প্রথমে ছেলে যদুকে বললেন, 'বাছা, সবই

তো শুনেছ। শুক্রাচার্যের শাপে আমার এই দশা হয়েছে। কিন্তু আমার সে রকম কিছু বয়স হয়নি। অনেক শখ আহ্লাদ বাকি আছে। তুমি যদি এক হাজার বছরের জন্য তোমার যৌবন আমাকে দিয়ে, আমার জরা নিজের শরীরে নাও, তাহলে আমার পরে তুমিই রাজা হবে।'

কিন্তু যদু সে প্রলোভনেও ভুললেন না। তিনি বললেন, 'আপনি কাউকে বলুন।' যযাতি রেগে গিয়ে বললেন, 'তুমি আমার কথা শুনলে না, তাই তুমি বা তোমার কোনো বংশধর রাজা হবে না।'

তুর্বসুও রাজি হলেন না। তাঁকে যযাতি শাপ দিলেন, 'তুমি নির্বংশ হবে আর পাপীদের রাজা হবে।'

দ্রুহ্যু ও অস্বীকার করলে, রাজা তাকে ভয়ংকর শাপ দিলেন, 'তোমার কোনো ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তোমার বংশের কেউ রাজা হবে না। যেখানে ভেলা ছাড়া কোনো যান-বাহন নেই, সেই দেশে তোমাকে বাস করতে হবে।' অনুও রাজি না হলে, যযাতি তাকে বললেন, 'যে জরা নিতে চাইছ না, সেই জরাই তোমাকে এখন গ্রাস করবে। তোমার সন্তানরা বাঁচবে না।'

কে ভেবেছিল যযাতি এমন হৃদয়হীন ব্যবহার করতে পারেন? ধার্মিক বলে তাঁর নাম ছিল। সে যাই হোক, ছোট ছেলে পুরু কিন্তু তখনি বাপের জরা নিতে রাজি হলেন। যযাতি তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার রাজ্যে সকলে সুখে বাস করবে।'

পুরুর যৌবন লাভ করে, যযাতি সুখ ভোগ আর সৎ কাজ করে এক হাজার বছর কাটিয়ে, পুরুর যৌবন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে, তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে, নিজে তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন।

জীবনে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি আর স্বার্থপরের মতো কাজ করলেও, বনে গিয়ে বহু দিন কঠোর তপস্যা, যাগ-যজ্ঞ করে তিনি অনেক পুণ্যও সঞ্চয় করেছিলেন। বলা বাহুল্য মারা গিয়ে তিনি স্বর্গে গেলেন। সেখানে কয়েক বছর পরম সুখে কাটাবার পর, ইন্দ্র তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি রকম তপস্যা করতে, মহারাজ?'

যযাতি বড়াই করে বললেন, 'আমার সমান তপস্যা ত্রিভুবনে কেউ

কখনো করেনি!' এত অহংকার ইন্দ্রের ভালো লাগল না। তিনি বললেন, 'অন্যরা কতখানি কি তপস্যা করেছে তার তুমি কতটুকু জান? তোমার এই অহংকারের জন্য এখনি তোমার স্বর্গ থেকে পতন হবে।'

আর যাই হোক, যযাতির মনের জোর ছিল। তিনি বললেন, 'যদি পতনই হয়, তবে যেন ভালো লোকদের মধ্যে পড়ি।' ইন্দ্র বললেন, 'তাই পড়বে।'

তারপর যযাতি স্বর্গ থেকে পড়তে পড়তে পৃথিবীর অর্ধেক পথ পার হয়ে এলেন। এমন সময় মহাশূন্যে কয়েকজন সাধু সজ্জনের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তাঁরা হলেন বসুমান, অষ্টক, প্রতর্দন আর শিবিরাজা। তাঁরা দেখলেন একজন তেজোময় পুরুষ আগুনের হল্কার মতো পৃথিবীর দিকে নামছেন। তাঁরা বললেন, 'তুমি কে? কেনই বা পৃথিবীর দিকে চলেছ?' যযাতি তাঁদের সব কথা বললেন।

তাঁরা বললেন, 'তা হয় না। আমাদের পুণ্যের ভাগ তোমাকে দিচ্ছি। তুমি ফিরে চল।' যযাতি প্রথমে রাজি হননি। বলেছিলেন, 'আমি রাজা। রাজারা দান করে, গ্রহণ করে না।' কিন্তু ঐ চারজন পুণ্যবান কোনো আপত্তিই শুনলেন না। তাঁদের পুণ্যফলে যযাতি আবার স্বর্গে গেলেন।

অমৃত আনার কথা

আগেই বলা হয়েছে শুক্রাচার্যের কাছ থেকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখে এসেছিলেন কচ। সেই মন্ত্র তিনি অন্যদেরো শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এতে যে দেবতাদের অনেক সুবিধা হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবু তাঁদের মনে ক্রমে ক্রমে অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল। দেবতারা মারা যাবেন, তারপর কেউ এসে মন্ত্রের সাহায্যে তাঁদের পুনর্জীবিত করবেন, এ নিয়ম খুব ভালো নয়। তার চেয়ে অমৃত পান করে অমর হয়ে গেলে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

এ বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য সুমেরু পর্বতে দেবতাদের এক

সভা বসেছিল। আলোচ্য বিষয় হল কি করে অমৃত পাওয়া যায়। নারায়ণের অজানা কোনো কিছু নেই। তিনি ব্রহ্মাকে বললেন, 'আপনারা একলা কিছুই করতে পারবেন না। অসুরদের এ-কাজ থেকে বাদ দিলে চলবে না। তাদের সাহায্য নিতে হবে। দুই দলে মিলে যদি সমুদ্র মন্থন কর, তাহলেই ঐ সমুদ্র থেকে অমৃত উঠে আসবে।'

মন্থন করা মানে এক বিশাল দণ্ড দিয়ে পাক দিতে হবে। যেমন করে দুধ থেকে মাখন তোলা হয়।

নারায়ণের কাছ থেকে এই বুদ্ধি নিয়ে, ব্রহ্মা সব দেবতাদের ডেকে বললেন, 'অমৃত পেতে হলে, সমুদ্র মন্থন করতে হবে। দেবতা অসুর মিলে পাক দিতে হবে। একটু-আধটু পাক দেওয়া নয়, অনেকক্ষণ ধরে দিতে হবে। তোমরা একেবারে হাঁপিয়ে উঠবে, তবু থেমো না। পাক দিতে দিতে অনেক রকম চমৎকার জিনিস পাবে। কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে মন্থন করা থামিও না। প্রাণপাত করে পাক দিও। শেষে অমৃত উঠবেই।'

ব্রহ্মার কথা শুনে সকলের মন আশায় আর আনন্দে ভরে গেল। তাঁরা তখনি মন্থনের আয়োজন শুরু করলেন। অমৃতের অর্ধেক ভাগ দেবার লোভ দেখিয়ে অসুরদের সহযোগিতা সহজেই পাওয়া গেল।

আয়োজন তো সামান্য নয়। পাক দেবার দণ্ড চাই, তাকে বলে মন্থনবাড়ি। দণ্ডের গায়ে দড়ির প্যাঁচ দিতে হবে, সেই মন্থন দড়ি চাই।

উপযুক্ত মন্থন-বাড়ি পাওয়াও এক সমস্যা। সাধারণ বাঁশগাছ-তাল গাছের কর্ম নয়। এত উঁচু হওয়া চাই যে আকাশের কাছাকাছি পৌঁছবে। হাজার হাজার যোজন লম্বা বাড়ি লাগবে।

মন্দর পর্বত বাইশ হাজার যোজন লম্বা। তাকে দিয়ে কাজ চলতে পারে। পর্বতের অর্ধেক মাটির তলায় গাড়া, অর্ধেকটা উপরের পৃথিবীতে। তাকে উপড়িয়ে তুলে, সবটাকে কাজে লাগাতে হবে। শুধু ন্যাড়া একটা পাহাড় তো নয়। গাছ-পালায় ঢাকা। বাঘ, ভাল্লুক, গন্ধর্ব, কিন্নর, সাপ, পাখি এই সবের বাসভূমি। সবসুদ্ধ তুলতে হবে। দেবতারা এবং অসুররা সকলে মিলে প্রাণপণে টানাটানি, হাঁচড়পাঁচড়

করলেন। পাহাড়ের অতি প্রাচীন ভিৎ এতটুকু টস্কাল না!

শেষটা লজ্জার মাথা খেয়ে নারায়ণ আর ব্রহ্মার কাছে যেতে হল। নারায়ণ অতি সহজে সমস্যার সমাধান করে দিলেন। অনন্ত নাগকে বললেন, 'বাছা, পাহাড়টা উপড়িয়ে তুলে দিয়ে এসো তো।'

অনন্তর মাথায় সমস্ত পৃথিবী ভর করে থাকে। তাঁর পক্ষে মন্দর পর্বত উপড়ানো সামান্য ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পাহাড় পেঁচিয়ে চড়-চড় করে তুলে দিলেন। মন্দর পর্বত নিয়ে অনন্ত নাগের সঙ্গে দেবতারা আর অসুররা সমুদ্রের ধারে পৌঁছলেন।

পাক দিতে হলে শুধু ডাণ্ডা নয়, দড়িও দরকার। সে রকম লম্বা দড়ি কোথায় পাওয়া যাবে ? অনন্ত নাগের বিশাল লম্বা শরীর। তিনিই দড়ির কাজ করতে প্রস্তুত।

আরো কিছু দরকার। মন্থন-দণ্ডের তলায় একটা শক্ত কিছু চাই, নইলে মন্দর পর্বত সমুদ্রের তলার নরম কাদা ফুঁড়ে বসে যাবে। তাহলে তাকে দিয়ে পাক দেওয়া যাবে না। তারো ব্যবস্থা হল। শক্ত জিনিস ছিল। অনন্তর মাথার উপর পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। আবার তাঁকে ধারণ করে আছেন মহা-কচ্ছপ কুর্মরাজ। কুর্মরাজের খোলার চেয়ে শক্ত কিছু পাওয়া যাবে না। দেবতারা তখন বিনীতভাবে কুর্মরাজকে বললেন, 'রাজন, আপনি মন্দর পর্বতকে পিঠে ধারণ করে আমাদের সাহায্য করুন।' কুর্ম তখনি রাজি হলেন। এবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল।

কুর্মরাজ সমুদ্রের তলায় বসলেন। অনন্ত তাঁর পিঠে মন্দর রেখা, নিজের লম্বা শরীরটা পাহাড়ের চারদিকে জড়িয়ে দিলেন। দেবতারা ধরলেন তাঁর ল্যাজ। অসুররা ধরলেন মাথা। তারপর পাক দেওয়া শুরু হল। সে বিষম কাণ্ড কল্পনা করা যায় না। একবার দেবতারা টানেন, একবার অসুররা। শব্দে নিশ্চয় সকলের কানে তালা লাগার যোগাড় হয়েছিল। সে আওয়াজে নাকি ত্রিভূবন কেঁপে উঠেছিল। সমস্ত পৃথিবী টলমল করে উঠেছিল। কত মাছ মরেছিল। পাহাড়ে আগুন ধরে গিয়েছিল, পাকের চোটে এমনি গরম হয়ে উঠেছিল। শুধু

কি তাই, ঐ পাহাড়ের বুকে নানা রকম মূল্যবান রত্ন মণি ধাতু ওষুধ ইত্যাদি ছিল। সে সমস্ত গলে গড়িয়ে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল। জল দুধের মত সাদা হয়ে উঠল। সেই দুধ থেকে চমৎকার ঘি বেরোল।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল, পাক দেওয়ার বিরাম নেই। দেবতাদের শরীরে তো আর অসুরদের মতো জোর ছিল না, তাঁরা আগে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এই বুঝি পাকে ক্ষান্তি দেন। তাহলেই তো এত করেও সব পণ্ড হবে। স্বয়ং নারায়ণ এসে তাঁদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাঁরা নতুন বল পেয়ে, আরো জোরে পাক দিতে লাগলেন।

হঠাৎ দেখলেন চারদিক অতি সুন্দর স্নিগ্ধ আলোতে ভরে গেছে। প্রসন্ন বদনে চন্দ্রদেব জল থেকে উঠে এলেন। তাঁকে দেখে সকলে যতই না আশ্চর্য হলেন, পাক দেওয়া কেউ থামালেন না। চন্দ্রদেব অন্য দেবতাদের সঙ্গে আসন নিলেন। তার পর সেই ঘিয়ের সাগর থেকে অতি সুন্দর এক পদ্মফুল উঠল। সেই পদ্মের মাঝখানে লক্ষ্মীদেবী বসে! তাঁর মধুর রূপে চারদিক আলো হয়ে রইল।

লক্ষ্মীকে দেখে দেবতাদের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। তাঁরা জোরে জোরে পাক দিতে লাগলেন। আরো তিনটি জিনিস একে একে উঠল। একজন দেবতা, উচ্চৈঃশ্রবাঃ বলে একটি ঘোড়া, আর কৌস্তুভমণি।

আশ্চর্যের বিষয়, এ সব জিনিসই দেবতারা নিলেন, অসুরদের ন্যায্য ভাগ দেবার কথা কারো মনে হল না। ঘোড়াটি ইন্দ্র নিলেন আর কৌস্তুভ উঠেই নারায়ণের বুকে ঝুলে রইল।

তখনো সমানে মন্থন চলেছিল, তার ঘোর ঘন ঘর্ঘর শব্দে ত্রিভুবন কাঁপছিল। আরো পরে সমুদ্রের ভিতর থেকে চিকিৎসাবিদ্যার দেবতা ধন্বন্তরি উঠে এলেন। তাঁর হাতে সাদা কমণ্ডলু, কমণ্ডলুতে অমৃত।

এবার অসুরদের ধৈর্য ভাঙল। তাঁরা 'এটি আমাদের! এটি আমাদের!' বলে মহা কলরব করে উঠলেন। কিন্তু পাক দেওয়া চলতে লাগল। এবার ঐরাবত। চার দাঁত-ওয়ালা সাদা হাতি। তাঁকেও ইন্দ্র নিলেন।

তখনো পাক দেওয়া থামে না। সকলের মনে আশা, না জানি

আরো কি চমৎকার জিনিস ওঠে! উঠল কালকূট বিষ! তার গন্ধ নাকে যেতেই ত্রিভুবনের সকলে মূর্ছা গেল। ব্রহ্মার সে কি ভাবনা! শিবকে বললেন, 'একটা কিছু না করলে, সকলেই মারা যাবে।' শিবের মন কত মহান, কত উদার তা ভাবা যায় না। তিনি তখনি সেই উগ্র বিষের সবটুকু পান করে নিজের গলায় রেখে দিলেন। বিষের তীব্রতায় গলা নীল হয়ে গেল। এই জন্যে শিবের আরেক নাম নীলকণ্ঠ।

অন্য সব জিনিসের উপর দৈত্যদের কোনো লোভ ছিল না। তাঁরা চেয়েছিলেন শুধু অমৃত। এবার ধৈর্য হারিয়ে অমৃতের ভাণ্ডটি তাঁরা কেড়ে নিলেন। এতক্ষণ যা কিছু উঠেছিল দেবতারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন, অসুরদের কিছুই দেননি। এখন তাঁরাও জোরজার করে আসল জিনিসটি অধিকার করে বসলেন। তাঁদের সঙ্গে গায়ের জোরে তারা পেরে উঠবেন না, এ-কথা দেবতারা নিজেরাও জানতেন।

দেবতাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তবে কি সব করেও কিছু পাবেন না! নারায়ণ তাঁদের সাহায্যে এলেন। তিনি এক সুন্দরী কন্যা সেজে, অসুরদের কাছে গেলেন। এত রূপ অসুররা কখনো দেখেন নি। তাঁদের মুখে কথা নেই; চোখে পলক পড়ে না; দেখে দেখে মন ওঠে না! বুদ্ধিশুদ্ধি গোলমাল হয়ে গেল, সুন্দরী তাঁদের মন্ত্রমুগ্ধের মতো করে ফেলল। তারপর যখন সে হাত বাড়িয়ে, হাসিমুখে অমৃতের ভাণ্ডটি চেয়ে বসল, মন্ত্রচালিতের মতো তাঁরা তার হাতে সেটি তুলে দিলেন।

ছদ্মবেশী সুন্দরী তখন অমৃতের পাত্রটি দেবতাদের দিলেন। তাঁরা আর সময় নষ্ট না করে অমৃত পান করতে লাগলেন। অসুররা কিছুই পেলেন না। রাহু নামে এক চতুর দানব দেবতা সেজে অমৃত খাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্র সূর্য তাঁকে চিনতে পেরে, নারায়ণকে জানালেন। মুহূর্তের মধ্যে নারায়ণের সুদর্শন চক্র ছুটে এসে রাহুর গলা কেটে ফেলল। এক ঢোক অমৃত বেচারি সবেমাত্র খেয়েছিলেন, সেটুকু গলা অবধি নেমেছিল। ঐ পর্যন্ত দেহ তার অমর হয়ে গেল।

আজ পর্যন্ত তিনি আকাশ পথে অপেক্ষা করে থাকেন। মাঝে মাঝে চন্দ্র সূর্যকে কাছে পেলে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টাও করেন। দুঃখের বিষয় গলার নিচে থেকে বাকি শরীর নেই, চাঁদ সূর্যকে গিলে ফেললেও, কিছু পরে তাঁরা রাহুর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসেন।

সব দিক দিয়ে বঞ্চিত হয়ে অসুরদের ক্ষোভের আর শেষ রইল না। এবার যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু তার ফলে যা হবার তা হল। দেবতারা অমর হয়েছেন, অসুরদের কোনো অস্ত্রেই তাঁরা মরলেন না। ওদিকে দেবতাদের অস্ত্রের সামনে অসুরদের বাঁচবার কোনো আশাই রইল না। শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে তাঁরা হয় মাটির নিচে, নয় সমুদ্রের তলায় আশ্রয় নিলেন।

মন্দির পাহাড়কে যথাস্থানে রেখে, অনন্ত নাগকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, অমৃতের ভাণ্ডটি নারায়ণের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে, দেবতারা স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। এই যুদ্ধের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে কেউ মাথা ঘামালেন না।

এইভাবে ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে দিয়ে দেবতারা অসুরদের সাহায্য নিয়েও তাঁদের বঞ্চিত করে, নিজেরা অমর হলেন। কিন্তু অমর হয়ে তাঁরা যতটা নিরাপদ হবেন ভেবেছিলেন, তা হতে পারেননি। তার কারণ দৈত্যদের হাতে তাঁদের মৃত্যু হবার ভয়টা দূর হয়েছিল বটে, কিন্তু ঐ সব রুষ্ট, ক্ষুব্ধ, প্রচণ্ড বলবান শত্রুদের হাতে বেদম মার থেকে কেউ তাঁদের রক্ষা করতে পারত না। কাজেই দূর থেকে দৈত্য দেখলেই তাঁদের সেখান থেকে পালানো ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। যুদ্ধেও অনেক সময় তাঁদের হার হত। বিশেষ করে কালের বংশের কালেয় দৈত্যরা ছিল বড়ই সাংঘাতিক। তাদের দলপতি বৃত্রকে কি রকম বীরের অযোগ্য ভাবে মেরে ফেলা হয়েছিল সে অন্য গল্প।

আমরা সাধারণ লোকেরা জানি দেবতারা হলেন পুণ্যাত্মা, শুভ ও মঙ্গলের সহায়। দৈত্যরা পাপাত্মা, জঘন্য অশুভ আচরণ করেন তাঁরা। কিন্তু অনেক গল্পে এই দুই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। দেবতাদের কেউ কেউ অন্যায় কাজ করেন; দৈত্যদের মধ্যে মহা ধার্মিক বিরাজ করেন।

সগর রাজা আর তাঁর পুত্রদের কথা

পুরাণে আছে ইন্দ্রের হাতে কালেয়দের নেতা বৃত্রাসুর বধ হয়েছিলেন। আসল কথা হল একা ইন্দ্র পেরে ওঠেননি। নারায়ণ তাঁকে নিজের দেহ থেকে খানিকটা তেজ দিয়েছিলেন, তবে কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। নেতা মারা গেলে কালেয়রা সমুদ্রের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল আর মাঝে মাঝে সেখান থেকে উঠে এসে দেবতাদের আর তাঁদের আশ্রিতদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন। তাড়া করলে জলের তলায় লুকোতেন। তাঁদের সঙ্গে অমর দেবতারা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারতেন না।'

শেষকালে উপায় না দেখে আবার নারায়ণের শরণাপন্ন হতে হল। নারায়ণ বললেন, 'মহামুনি অগস্ত্যকে বল সাগরের সব জল খেয়ে ফেলতে। তাহলে অসুরদের আর লুকোবার জায়গা থাকবে না।

তাই হল। অগস্ত্য সব জল খেয়ে শেষ করলেন। অসুরদের বাগে পেয়ে দেবতারা মনের সুখে তাঁদের নিধন করলেন। মাত্র কয়েকজন পাতালে গিয়ে বাঁচলেন।

যখন দেবতারা দেখলেন, সর্বনাশ! সমুদ্রের যে তলা দেখা যাচ্ছে! তাঁরা অগস্ত্যকে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন, 'সে ব্যাটারা তো মরেছে, এবার জলটুকু উগরে দিন। নইলে সর্বনাশ হবে!'

অগস্ত্য বললেন, 'সে কখন হজম হয়ে গেছে। অন্য উপায় দেখ।' এই বলে নিজের কাজে চলে গেলেন। বহুকাল ধরে মরা সাগর খাঁ খাঁ করতে লাগল।

এদিকে ইক্ষাকু বংশে সগর বলে এক রাজা ছিলেন। রূপে গুণে তেজে বীরত্বে তাঁর সমান কেউ ছিল না। তাঁর দুই রাণী, বৈদর্ভী আর শৈব্যা, কিন্তু ছেলে ছিল না বলে রাজা রাণীর বড় দুঃখ। দীর্ঘকাল তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করে তাঁর বরে বৈদর্ভীর ষাট হাজার ছেলে আর শৈব্যার একটি ছেলে হল। বৈদর্ভীর ছেলেরা আবার একটা লাউয়ের মধ্যে জন্মেছিল। আরেকটু হলেই তাদের ফেলে দেওয়া

হচ্ছিল। এমন দৈববাণী হল 'লাউ ফেলো না। ওর মধ্যে ষাট হাজার বিচি আছে। সেগুলোকে নিয়ে কলসিতে রেখে দাও, সময় হলে ওর থেকে ষাট হাজার সুন্দর ছেলে বেরোবে।

ঠিক তাই হল। কিন্তু দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, ছেলেগুলোর গায়ে যেমনি জোর, মাথায় তেমনি বদ্‌বুদ্ধি। তাঁদের জ্বালায় মানুষের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, দেবতা গন্ধর্বরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। ব্রহ্মা তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'কোনো ভয় নেই। শীঘ্রই নিজেদের স্বভাবদোষে ওদের সর্বনাশ হবে।'

ওদিকে শৈব্যার একটি ছেলে, তার নাম অসমঞ্জ। সে এমনি নিষ্ঠুর ছিল যে ছোট ছোট শিশুদের ধরে জলে ফেলে দিত। প্রজারা আর সইতে না পেরে যখন রাজার কাছে নালিশ করল, সগর এমন হৃদয়হীন ছেলেকে নির্বাসন দিলেন। অংশুমান নামে অসমঞ্জর একটি ছেলে ছিল।

চারদিকে সগর রাজার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন স্থির করলেন। এই যজ্ঞে একটি সুসজ্জিত ঘোড়া ছেড়ে দিতে হয়। সঙ্গে রক্ষক থাকে। ঘোড়া দেশে দেশে ছুটে বেড়ায়, সাধারণতঃ কেউ তাকে বাধা দেয় না। সকলেই ঘোড়ার মালিকের প্রাধান্য মেনে নেয়। কিন্তু কেউ যদি ঘোড়া আটকায়, তাহলে রক্ষকদের কাজ যুদ্ধ করে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।

সগর তাঁর ষাট হাজার গুণধর ছেলেকে ঘোড়ার রক্ষক করে দিলেন। কিছুদিন এ-দেশ ও-দেশ করবার পর, ঘোড়া শুকনো সমুদ্রের ধারে পৌঁছল। তারপর সেই জলশূন্য বিশাল প্রান্তরের ওপর দিয়ে দৌড় দিল। রাজপুত্ররাও পিছন পিছন ছুটল। কিন্তু ঘোড়াটিকে তারা আর দেখতে পেল না। কোথায় গেল, কোথায় গেল, বলে খানিক ঘোরাঘুরির পর, দেশে ফিরে গিয়ে তারা রাজাকে বলল, 'ঘোড়া হারিয়ে গেছে। অনেক সন্ধান করেও তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।'

এ-কথা শুনে সগর রাজা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। এদিকে তো অপকর্মের শেষ নেই, তার উপর এই রকম অকর্মার ধাড়ি! তিনি তাদের খুব কড়া কথা বলে ভালো করে খুঁজে ঘোড়া উদ্ধার করে

আনতে আদেশ দিলেন। তারা ফিরে গিয়ে পাহাড় পর্বত বন গ্রাম নগর বন্দর তন্নতন্ন করে খুঁজে, হতাশ হয়ে আবার ফিরে এল।

সগর তাদের কটু কথা বলে তাড়িয়ে দিলেন। বললেন যে, ঘোড়া না পেলে তারা যেন আর দেশে না ফেরে। কি আর করে ছেলেরা। আবার সেই শুকনো সমুদ্রের ধারে গিয়ে ভালো করে জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করল। এবার চোখে পড়ল এক জায়গায় কেমন খানিকটা খোঁদল মতো। বেশ গভীর গর্তটা।

তখন তারা প্রত্যেকে একটা কোদাল নিয়ে গর্তের চারিদিকে খুঁড়ছে তো খুঁড়ছেই। মাস গেল, বছর গেল, গর্তের তল পাওয়া গেল না। উঁকি মেরে দেখলে গর্তের ভিতরটাতো খালি অন্ধকার দেখা যায়। রেগেমেগে আরো খুঁড়তে লাগল। এমনি করে খুঁড়তে খুঁড়তে একদিন তারা একেবারে পাতালে পৌঁছে গেল।

রাগে ক্লান্তিতে তখন তাদের অবস্থা শোচনীয়। পৌঁছেই দেখে এক মুনি ধ্যান করছেন আর ঘোড়াটা তাঁর কাছেই ঘাস খাচ্ছে। দেখে তাদের পিত্তি জ্বলে গেল। এমনিতেই ভারি রূঢ় উদ্ধত স্বভাব তাদের, এখন তার উপর মেজাজও খিঁচড়ে আছে। ঐ মুনি হলেন কপিলমুনি, ভয়ঙ্কর তেজ তাঁর। তাঁর প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা বা সৌজন্য না দেখিয়ে ষাট হাজার রাজপুত্র চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ঘোড়ার দিকে ছুটল।

সেই হট্টগোলে মুনির ধ্যান ভেঙে গেল। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি শুধু একবার তাদের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নারদমুনি ঐ সময় সেখানে এসেছিলেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। সোজা সগরকে গিয়ে ব্যাপারটা জানালেন। এই শোক সংবাদে সগরের মুখে কথা নেই! তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে অসমঞ্জর ছেলে অংশুমানকে বললেন, 'বাছা, তুমি যদি ঘোড়াটি না নিয়ে আস, তাহলে সব পণ্ড হবে।'

অংশুমান আর অপেক্ষা না করে অকুস্থলে পৌঁছে সেই সর্বনাশ গর্ত দেখতে পেলেন। গর্ত দিয়ে নেমে তিনিও পাতালে পৌঁছে দেখলেন কপিল মুনি সেইখানেই বসে আছেন। অংশুমানের প্রকৃতি অন্য রকম

ছিল। তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করে, জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর এই বিনীত ব্যবহার দেখে সন্তুষ্ট হয়ে, মুনি বললেন, 'বাছা, তুমি কি চাও ?'

অংশুমান তেমনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'ভগবন্, আপনি যদি দয়া করে আমাকে ঘোড়াটি দেন, তাহলে পিতামহের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।'

মুনি বললেন, 'তাই নাকি ? এত কথা তো আমি জানি না। তোমাদের ঘোড়া নিয়ে যাবে বৈ-কি। আর কি চাও বল।'

অংশুমান তখন আরো কোমল স্বরে বললেন, 'আমার কাকারা সকলে ছাই হয়ে গেছেন, দয়া করে তাঁদের উদ্ধার করে দিন।'

মুনি বললেন, 'বাছা, তুমি যখন বলছ, তখন তা-ও হবে। তবে এখনি হবে না। এত সহজেও হবে না। তোমার যে নাতি হবে, সে তপস্যা করে শিবকে তুষ্ট করবে। তারপর তাঁর দয়ায় স্বর্গ থেকে গঙ্গা-দেবীকে সে পৃথিবীতে নামাবে। হিমালয় থেকে বয়ে এসে গঙ্গানদী যখন তাদের ছাইয়ের উপর পড়বে, তখনি তারা উদ্ধার হয়ে যাবে। এখন তুমি ঘোড়া নিয়ে দেশে ফিরে যাও। তোমাদের যজ্ঞ মঙ্গলমতে সম্পন্ন হোক। তোমার মঙ্গল হোক।'

মুনিকে প্রণাম করে, ঘোড়া নিয়ে অংশুমান দেশে ফিরে এলেন। মঙ্গলমতে যজ্ঞ শেষ হল। সকলে কপিল মুনির কাহিনী শুনল। অংশুমানের ছেলে দিলীপ সব কথা শুনে গঙ্গা নামাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি।

দিলীপের ছেলের নাম ভগীরথ। তাঁর মতো ধার্মিক, হৃদয়বান, সাধু আর সত্যবাদী রাজা কম দেখা গিয়েছে। সগরের ষাট হাজার ছেলের শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনে তাঁর বড় কষ্ট হয়েছিল! তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলেন অসাধ্য সাধন করে তিনি ঐ হতভাগ্য পিতামহদের উদ্ধার করবেন।

যখন তার সময় হল তখন মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে ভগীরথ তপস্যা করতে হিমালয়ে চলে গেলেন। এক হাজার বছর কঠোর তপস্যা করবার পর গঙ্গাদেবী দর্শন দিয়ে বললেন, 'রাজা, তুমি এত কষ্ট

করছ কেন ?

ভগীরথ বললেন, 'দেবী! কপিলমুনির কোপে পড়ে আমার পিতামহের ষাট হাজার ভাই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ ভাবে মারা গেলে কেউ স্বর্গে যায় না। কপিল বলেছেন তাঁদের ছাইয়ের উপর দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হলে, তবে তাঁদের মুক্তি হবে। তাই আমি ভক্তিভরে করজোড়ে এই প্রার্থনা করি মা, তুমি দয়া করে পৃথিবীতে নেমে এসো।'

গঙ্গাদেবী বললেন, 'তুমি যখন বলছ, তখন আমি নিশ্চয় নেমে আসব। তবে একটা বিপদের কথাও বলি। স্বর্গ থেকে সোজা পৃথিবীতে পড়লে, পৃথিবী আমার স্রোতের বেগ সহ্য করতে পারবে না। তুমি শিবকে বল তিনি যেন মাথা পেতে আমার স্রোতকে ধারণ করেন, নইলে জগৎ ভেসে যাবে।'

শিবকে তো যা খুশি তাই বলা যায় না। ভগীরথ কৈলাস পাহাড়ে গিয়ে শিবের তপস্যা আরম্ভ করলেন। শিব সহজেই তুষ্ট হন। স্বর্গ থেকে গঙ্গা যখন নামলেন, শিব তাঁকে জটায় ধরলেন। তারপর বেগ কমে এলে পৃথিবীতে ছেড়ে দিলেন।

মাটিতে পৌঁছে গঙ্গা ভগীরথকে বললেন, 'বাছা, তুমি আগে আগে যাও। আমি তোমার পিছন পিছন যেখানে তুমি নিয়ে যাবে, সেখানে যাব। বিশাল শাঁখ বাজাতে বাজাতে ভগীরথ পথ দেখিয়ে চললেন। গঙ্গাও কলকল ঝরঝর করে সঙ্গে চললেন। এমনি করে এক দিন তাঁরা শূন্য সাগরের মাঝখানের সেই গর্ত দিয়ে পাতালে প্রবেশ করলেন। সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের ভস্মের উপর দিয়ে গঙ্গার পবিত্র নির্মল জল বয়ে যাবামাত্র সগরের হতভাগ্য ছেলেরা উদ্ধার হয়ে, ভগবানের স্তব করতে করতে স্বর্গে চলে গেল। ভগীরথের কাজও শেষ হল।

তারপর গঙ্গার অফুরন্ত জলধারায় শূন্য সাগর আবার পূর্ণ হল। সে জল যে কি মিষ্টি ছিল সে আর কি বলব। এর অনেক পরে, সমুদ্র বিষ্ণুকে অপমান করেছিল, তাই তাঁর শাপে সেই মিষ্টি জল নোনতা হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল।

নানা ভাবে ঐ জল পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ভগীরথ গঙ্গাকে এনেছিলেন বলে গঙ্গার আরেক নাম ভাগীরথী। জাহ্নবী নামও শোনা যায়। সে বড় মজার ঘটনা। শাঁখ বাজিয়ে ভগীরথ আগে আগে চলেছেন, তাঁর পায়ে পায়ে গঙ্গা চলেছেন। পথের মধ্যে কোথায় কি হচ্ছে, সে দিকে কারো খেয়াল নেই।

এদিকে জহ্নুমুনি সেই পথে পূজোর উপকরণ সাজিয়ে পূজোয় বসেছেন। গঙ্গা সে-সব যত্ন করে সাজানো জিনিস ভাসিয়ে দিলেন। জহ্নুর রাগ দেখে কে! সঙ্গে সঙ্গে চোঁ-চোঁ করে গঙ্গাকে পান করে শেষ করলেন! তাই দেখে ভগীরথের চক্ষুস্থির! অনেক স্তব স্তুতি করার পর মুনি তাঁর উরু চিরে গঙ্গাকে আবার বের করে দিলেন, তবে বিপদ কাটল। জহ্নুমুনির দয়ায় গঙ্গাকে আবার ফিরে পাওয়া গিয়েছিল বলে গঙ্গার আরেক নাম জাহ্নবী।

পরশুরাম

মহর্ষি ঔর্বের কথা আগেও বলা হয়েছে। তাঁর অনেক মহৎ গুণ ছিল, সেই সঙ্গে অন্যায় দেখলে মনের মধ্যে এমন রাগের আগুন জ্বলে উঠত তাতে শত্রুরা জ্বলে পুড়ে খাক হতে পারত। সে রাগ সংবরণ করবার ক্ষমতাও ছিল, এই যা রক্ষা।

ঔর্বের ছেলের নাম ঋচীক। ঋচীক ছিলেন রূপে গুণে জ্ঞানে ধর্মে অতুলনীয়। লোকে তাঁকে মহর্ষি ঋচীক বলত। সব বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু ধর্মকর্ম, জ্ঞানসাধনা নিয়ে থাকতেন তাঁরা, তাই বৈষয়িক দিক থেকে বড়ই গরীব।

কান্যকুব্জের রাজা গাধির এক রূপসী মেয়ে ছিল। তার নাম সত্যবতী। ঋচীক সেই মেয়েকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। গাধির কাছে তিনি ঐ মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু ঋচীকরা দু-বেলা পেট ভরে খেতেও পেতেন না, কাজেই তাঁকে মেয়ে দিতে রাজার আপত্তি ছিল। কথাটা কিন্তু সোজাসুজি বলতে পারলেন না।

এত বড় জ্ঞানীগুণীকে ফিরিয়ে দিলে তিনি নিশ্চয় ক্ষুব্ধ হবেন, তাছাড়া লোকেও রাজার নিন্দা করবে। রাজা ভাবলেন বুদ্ধি খাটিয়ে, কৌশল করে কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

তিনি বললেন, 'আমাদের বংশের নিয়ম হল যে পাত্ররা পণ দেয়, তবে আমাদের মেয়েদের বিয়ে করে। তুমি কি সে রকম পণ দিতে পারবে?'

ঋচীক বললেন, 'কি পণ দিতে হবে বলুন, তারপর চেষ্টা করতে পারি।'

গাধি বললেন, 'আমাকে এক হাজারটি অতি চমৎকার তেজী ঘোড়া এনে দিতে হবে। তাদের গায়ের রং হবে ধবধবে সাদা; আর একটা কানের ভিতরটা লাল, বাইরেটা কালো। এমন ঘোড়া এনে দিলে, আমিও মেয়ে দেব।'

রাজা জানতেন এরকম এক হাজার ঘোড়া কোথাও কিনতে পাওয়া যাবে না; গেলেও ঋচীক তার দাম দিতে পারবেন না। বেশ কৌশল করা গেল।

ঋচীককে রাজা যথেষ্ট চিনতেন না। তিনি ঐ রকম অদ্ভুত ঘোড়া খুঁজতে হাটেও গেলেন না, টাকার চেষ্টাও করলেন না। তিনি সোজা বরুণদেবের কাছে গিয়ে ঐ ঘোড়া চেয়ে বসলেন। বরুণদেব তখনি প্রসন্নচিত্তে বললেন, 'মুনিঠাকুর, আপনি দেশে ফিরে যান। ঘোড়ার জন্য চিন্তা করবেন না। দেশে পৌঁছে ঐ রকম এক হাজার ঘোড়া মনে করবামাত্র, তারা আপনার সামনে দেখা দেবে। এখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার কষ্টও করতে হবে না।'

এ কথা শুনে প্রফুল্ল মনে ভজন গাইতে গাইতে মুনি কান্যকুব্জের গঙ্গার তীরে পৌঁছলেন। হঠাৎ মনে হল, এবার ঘোড়াগুলো এলে বেশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে চিঁহি চিঁহি ডাকতে ডাকতে তারা গঙ্গার বুক থেকে উঠে এল। তাই আজ পর্যন্ত ঐ জায়গার নাম অশ্বতীর্থ।

তারপর ঘোড়া নিয়ে ঋচীক গাধির কাছে উপস্থিত হলেন। তাই দেখে গাধির চক্ষুস্থির! কিন্তু কথা যখন দিয়েছেন, এখন তার নড়চড় হবার উপায় নেই। শুভদিন দেখে সত্যবতীর সঙ্গে ঋচীকের বিয়ে

হয়ে গেল। ঋচীক সত্যবতীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন আর সত্যবতীও তাঁর মতো জ্ঞানীগুণী স্বামী পেয়ে ভারি সুখী।

তবু মনে একটা দুঃখ ছিল। সত্যবতীর ছেলে হয়নি। আর শুধু সত্যবতী কেন, তার মার-ও ছেলে ছিল না। দুজনের-ই বড়ই ছেলের ইচ্ছা। ঋচীকের জ্ঞানের সীমা ছিল না। তিনি দুটি পাত্রে পায়েস তৈরি করে, একটি সত্যবতীর জন্য, একটি তাঁর মায়ের জন্য এনে দিলেন।

পায়েস নিয়ে সত্যবতী যখন তাঁর মায়ের কাছে গেলেন রাণী বললেন, 'দেখ মা, তোমার স্বামীর চেয়েও আমি তোমার বেশি মান্য। আমি যা বলি, তাই কর।' সত্যবতী বললেন, 'কি করতে হবে, বল।'

রাণী বললেন, 'তোমার পায়েসটা অনেক বেশি ভালো। ওটি আমাকে দিয়ে, এটি তুমি নাও।' সত্যবতী তখনি মায়ের আদেশমতো কাজ করলেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋচীক সব কথা জানতে পারলেন। তিনি সত্যবতীকে বললেন, 'কাজটা ভালো করলে না। তোমার মা হলেন রানী, তুমি তপস্বিনী। আমার ইচ্ছা ছিল তোমার ছেলে ধার্মিক তপস্বী হোক আর তোমার মায়ের ছেলে তেজস্বী বীর হোক। সেই রকম পায়েসই তৈরি করেছিলাম। এখন দেখছি তোমার ভাইটি হবে নিরীহ ব্রাহ্মণ আর তোমার ছেলে হবে প্রবল ক্ষত্রিয়।'

একথা শুনে সত্যবতীর মাথার আকাশ ভেঙে পড়ল। এমন ছেলে নিয়ে তিনি কি করবেন! কিন্তু ততক্ষণে পায়েস খাওয়া হয়ে গিয়েছিল আর কিছু করার উপায় ছিল না।

সত্যবতী কেঁদে বললেন, 'একটা কোনো উপায় কর। আমার নাতি উগ্র ক্ষত্রিয় হলে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ছেলে যেন ধার্মিক ব্রাহ্মণ হয়।

তাঁর মহাজ্ঞানী স্বামী বললেন, 'বেশ, তাই হবে। তোমার ছেলে ধার্মিক ব্রাহ্মণই হবে, কিন্তু নাতি হবে প্রবল যোদ্ধা।

সময় হলে সত্যবতীর একটি ছেলে হল। তার নাম রাখা হল জমদগ্নি। বড় হয়ে তিনি এক মহামুনি হয়েছিলেন। সত্যবতীর যে ভাই হল, তার নাম রাখা হল বিশ্বামিত্র। রাজা হয়েও তিনি পরে মুনি হয়েছিলেন।

জমদগ্নি বড় হয়ে রাজা প্রসেনজিতের মেয়ে রেণুকাকে বিয়ে করেন। তাঁদের পাঁচ ছেলে। সবার ছোট যিনি, তাঁর নাম রাম। তাঁর নানা গুণ ছিল। তিনিই সেই প্রবল যোদ্ধা নাতি, যার কথা ঋচীক বলেছিলেন। রাম দেবতাদের ভক্তি করতেন। অল্প বয়সেই তিনি গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে শিবের তপস্যা করেছিলেন। শিব তাঁকে নানা রকম আশ্চর্য অস্ত্র দিয়েছিলেন। তাছাড়া একটি অব্যর্থ কুঠার দিয়েছিলেন। কুঠার হল কুড়ুল। তার আরেক নাম পরশু। এই কুঠারের ধার কখনো কমতো না আর তার আঘাত এমনি প্রচণ্ড ছিল যে পাহাড় পর্বতও ভেঙে খানখান হতো। রাম সর্বদা ঐ পরশু হাতে নিয়ে ঘুরতেন বলে লোকে তাঁর নাম দিল পরশুরাম।

ঋচীকের কথা ব্যর্থ হয়নি। ব্রাহ্মণের ছেলে পরশুরামের যোদ্ধার মতো মন। নেতার আজ্ঞা পালন করা যোদ্ধার কাজ, তার ভালোমন্দ বিচার করাও নয়, কিংবা দয়া-মায়া দেখানোও নয়, এবার এর একটা নিদারুণ দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া গেল। জমদগ্নির সঙ্গে একদিন রেণুকার সামান্য কারণে খুব ঝগড়া হয়ে গেল। রেগেমেগে মুনি তাঁর ছেলেদের বললেন, 'ওকে মেরেই ফেল!' অন্য ছেলেরা এমন নির্মম কথা শুনে শিউরে উঠলেন। কিন্তু পরশুরাম সঙ্গে সঙ্গে পিতৃআজ্ঞা পালন করলেন।

তখনো জমদগ্নির রাগ যায়নি। তিনি অবাধ্যতার জন্য বড় চার ছেলেকে শাপ দিয়ে জানোয়ার করে দিলেন আর পরশুরামকে বললেন, 'তুমি আমার কথায় এমন কঠিন কাজ করেছ বলে আমি খুশি হয়েছি। কি বর চাও?'

পরশুরামের আসল পরিচয় এইবার পাওয়া গেল। তিনি বললেন, 'তাহলে আমার মা-কে বাঁচিয়ে দিন, ভাইদের আবার মানুষ করে দিন।' জমদগ্নি বললেন, 'বেশ, তাই হবে। আর কি চাও?'

পরশুরাম বললেন, 'আমার নিষ্ঠুর কাজের কথা মা-র যেন মনে না থাকে আর আমার যেন কোনো পাপ না হয়।' জমদগ্নি বললেন, 'তাই হবে। আর কি চাও।' পরশুরাম বললেন, 'আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর হতে চাই আর অমর হতে চাই।' জমদগ্নি বললেন 'তথাস্তু।'

এরপর একদিন জমদগ্নি আর রেণুকা ছাড়া আশ্রমে কেউ নেই, এমন সময় হৈহয়ের রাজা, কার্তবীর্যার্জুন সেখানে এলেন। মুনি আর তাঁর স্ত্রী তাঁর যথাসাধ্য আদর যত্ন করলেন। কিন্তু কার্তবীর্যার্জুন বড় লোভী ছিলেন। তাঁর নাকি এক হাজার হাত ছিল,সেই এক হাজার হাত দিয়ে তিনি যেখানে যা দেখে পছন্দ হত, তাই লুটে নিতেন। যুদ্ধের সময় হাজার হাতে হাজার অস্ত্র ধরতেন। তাছাড়া দেবতাদের বরে একখানি রথ ছিল, সেটি জলে স্থলে আকাশে সব বাধাবিঘ্ন ভেদ করে, অতি সহজেই গন্তব্যস্থানে চলে যেত। বোঝাই যাচ্ছে লোকে তাঁকে কি রকম ভয় করত আর তাঁর সব অত্যাচার কি ভাবে মেনে নিত। আর শুধু মানুষ কেন, দেবতারাও তাঁকে এড়িয়ে চলতেন।

জমদগ্নি আর রেণুকা এই পাষণ্ডের আপ্যায়নের জন্য যখন ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত, অতিথিটি তাঁদের আদর সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, আশ্রমের গাছপালা উপড়িয়ে শেষে মুনির হোমধেনুর বাছুরটিকে নিয়ে চলে গেলেন।

পরশুরাম বাড়ি ফিরে এ-কথা শোনামাত্র অস্ত্রশস্ত্র কুঠার নিয়ে কার্তবীর্যার্জুনের পিছনে ধাওয়া করলেন। দেখা হতেই ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু পরশুরাম যুদ্ধে অপরাজেয়। কার্তবীর্যার্জুনের এক হাজার হাতে ধরা এক হাজার অস্ত্রও কিছু করতে পারল না। দেখতে দেখতে ঐ ভীষণ কুঠারের ঘায়ে পাষণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে মারা পড়ল।

ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ নয়। কার্তবীর্যার্জুনের ছেলেরা বাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য জমদগ্নির ছেলেদের অনুপস্থিতিতে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে গেল। ফিরে এসে সে দৃশ্য দেখে পরশুরামের দুঃখের শেষ রইল না। মৃত্যুকালে বুড়ো বাবা তাঁর নাম ধরে ডেকেছিলেন, এ কথা ভেবেও তাঁর বুক ফেটে যেতে লাগল।

বাপের শেষ কাজ শেষ করেই, কুঠার নিয়ে পরশুরাম হত্যাকারীদের সন্ধানে গেলেন আর দেখা হওয়ামাত্র তাদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হল। বলা বাহুল্য তারা সকলে কুঠারের ঘায়ে প্রাণ দিল। তবু তাঁর রাগ পড়ল না। ঐ বংশের সকলে, তাদের আশ্রিত, তাদের বন্ধুবান্ধব আর সাহায্যকারীরা কেউ তাঁর হাত থেকে রেহাই পেল না। সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতের উপর

তাঁর রাগ হয়েছিল। সকলকে তিনি একবার নয়, একুশ বার মেরে শেষ করেছিলেন। প্রতিবারই কয়েকজন নানা ভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন, পরে তাঁরাই আবার নতুন বংশের সূচনা করেছিলেন।

ক্ষত্রিয়দের রক্তে সমস্ত পঞ্চক তীর্থে পাঁচটি হ্রদের সৃষ্টি হল। সেই রক্তে পূর্বপুরুষদের তর্পণ করে, তবে পরশুরামের রাগ কমেছিল। সব ক্ষত্রিয়দের হত্যা করাতে, তাঁদের সব রাজ্য পরশুরামের হস্তগত হয়েছিল। কিন্তু বিষয়-আশয়ে তাঁর কোনো লোভ ছিল না। তাই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, মহর্ষি কশ্যপকে সসাগরা পৃথিবী দক্ষিণা দিলেন। বুদ্ধিমান কশ্যপও এমন সুযোগ ছাড়লেন না। যে কজন ক্ষত্রিয় জীবিত ছিলেন তাঁদের রক্ষা করবার এই তো উপায় হল। এই মনে করে আঙুল দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকের পথ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'পুরুষোত্তম, তুমি এবার দক্ষিণ সমুদ্রের ধারে চলে যাও। আমাকে রাজ্য দান করে, এখানে তোমার থাকা শোভা পায় না।'

হৃষ্ট মনে পরশুরাম দক্ষিণের পথ ধরলেন। তাঁকে দেখেই দক্ষিণ সমুদ্র খানিকটা সরে গিয়ে, তাঁর থাকবার জায়গা করে দিলেন। সে দেশের নাম হল শূর্পাকার।

এদিকে কশ্যপমুনি জপতপ বোঝেন, রাজকার্য কিছুই জানেন না। কাজেই রাজ্য শাসনের ভার ব্রাহ্মণদের দিয়ে, তিনি ধর্মকর্মে মন দিলেন। ব্রাহ্মণেরাও পৃথিবী পেয়ে মহা খুশী হয়ে, জপতপ করতে লাগলেন। প্রজাপালনও যে একটা কর্তব্য, সে কথা তাঁদেরো মনে হল না।

দিনে দিনে রাজ্যগুলোর সুখশান্তি আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে লাগল। কেউ আর দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করে না। ভালো লোকরা না খেয়ে মরে আর দুর্বৃত্তরা দুষ্কর্ম করে দিনে দিনে প্রবল হয়ে ওঠে।

পৃথিবী আর কত সহ্য করবেন? ক্রমে তিনি রসাতলের দিকে নামতে আরম্ভ করলেন। এই সর্বনাশ মহামুনি কশ্যপের চোখে পড়াতে, নিজের উরু দিয়ে তিনি পৃথিবীর পতন বন্ধ করলেন। তখন পৃথিবী-মা

তাঁকে বললেন, 'রাজা না থাকলে রাজ্য পালনও হবে না। যে রাজারা মারা গেছেন, তাঁদের ছেলেদের কয়েকজনকে আমি নানা উপায়ে রক্ষা করে লুকিয়ে রেখেছি। তাদের খুঁজে এনে সিংহাসনে বসাও।'

কশ্যপ তখনি সেই কাজের ভার নিলেন। ঋক্ষবান পাহাড়ের ভাল্লুকদের যত্নে রক্ষিত বিদূরথের ছেলেকে আনা হল। সৌকাসের ছেলেকে মহর্ষি পরাশর এনে দিলেন। প্রতর্দনের ছেলে বৎসকে বাছুররা লুকিয়ে রেখেছিল, তাঁকে পাওয়া গেল। শিবির ছেলে গোপতিকে গোমাতারা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তাঁকেও পাওয়া গেল। দিবিরথের ছেলেকে মহর্ষি গৌতম মানুষ করছিলেন। বৃহদ্রথকে গৃধ্রকূট পাহাড়ের বানররা পালন করছিল। এঁদের পাওয়া গেল। সমুদ্রও মরুও রাজার আত্মীয় কয়েকজন রাজকুমারকে রক্ষা করেছিলেন। এবার তাঁদের এনে দিলেন।

এই সব ক্ষত্রিয় ছেলেদের এনে কশ্যপমুনি যথা সম্ভব শিক্ষা দিয়ে রাজ্য-শাসনের ভার দিলেন। তাঁরা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন আর সব বিষয়ে ধর্ম রক্ষা করে, পৃথিবীতে আবার মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করলেন।

সেকালের আদর্শ

সেকালে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা কি রকম ধর্মপ্রাণ ছিলেন, এখনকার বৈষয়িক যুগে সে-কথা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। সে বিষয়ে অনেক অতি সুন্দর গল্প শোনা যায়।

বাহুদা নামে এক প্রাচীন নদী ছিল। বাহুদা মানে যে বাহু অর্থাৎ হাত দান করে। নদীর এরকম অদ্ভুত নাম কেন হল, সে বিষয়ে একটি চমৎকার গল্প আছে। সেকালে ঐ নদীর ধারে দুটি আশ্রম ছিল। শঙ্খ আর লিখিত নামে দুই ভাই ঐ দুই আশ্রমে বাস করতেন। দুজনেই অতি পুণ্যবান তপস্বী ছিলেন আর দুজনার মধ্যে গভীর ভালোবাসা ছিল।

একদিন ছোট ভাই লিখিত শঙ্খের আশ্রমে গিয়েছেন। দেখেন শঙ্খ

বাড়ি নেই। দাদা না ফেরা পর্যন্ত সময় কাটাবার জন্য লিখিত আশ্রমের চারদিকে বেড়াতে লাগলেন। ফলের বাগানে গিয়ে দেখলেন ডালে ডালে পাকা ফল ঝুলছে। লিখিতের খিদেও পেয়ে থাকবে, তাই তিনি কিছু মিষ্টি ফল পেড়ে মনের আনন্দে সেগুলি খেতে লাগলেন।

এমন সময় শঙ্খ ফিরে এলেন। ভাইকে দেখে তাঁর বড়ই আনন্দ হল। তাঁকে আদর করে কাছে বসিয়ে বললেন, 'কিন্তু ও-ফল তুমি কোথায় পেলে ?'

হাসতে হাসতে লিখিত বললেন, 'কেন, তোমার গাছ থেকে পেড়ে নিলাম। বড্ড খিদেও পেয়েছিল, আর ফলগুলোর-ও তুলনা হয় না।'

লিখিতের কথা শুনে ভারি দুঃখের সঙ্গে শঙ্খ বললেন, 'ভাই, কাজটা ভালো হয়নি। আমাকে না বলে তুমি আমার ফল খেয়েছ, একে চুরি বলে। যে না বলে অন্যের জিনিস নেয় সে চোর। চুরি করা মহাপাপ। দেশের আইনে তার জন্যে শাস্তির বিধান আছে। তুমি রাজার কাছে গিয়ে, তোমার পাপের শাস্ত চাও।'

লিখিত এত কথা ভাবেন নি। এখন দোষ হয়ে গেছে, কাজেই রাজার কাছে গিয়ে অন্যায়টা স্বীকার করে, শাস্তি চেয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সুদ্যুম্ন তখন ঐ দেশে রাজত্ব করতেন। তাঁর মতো ধার্মিক রাজা সচরাচর দেখা যায় না। শঙ্খ আর লিখিতকে তিনি ভারি ভক্তি করতেন। লিখিত হঠাৎ তাঁর সভায় উপস্থিত হলে, তাঁকে কি বলে আপ্যায়ন করবেন রাজা ভেবে পান না। বিনয়ের সঙ্গে বারবার বলতে লাগলেন, 'ভগবান, বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।'

লিখিত বললেন, 'মহারাজ, আমি অপরাধ করে শাস্তির জন্য কাছে এসেছি। আপনি কথা দিয়েছেন আমি যা বলব তাই করবেন, এখন নিজের কথা রাখুন। আমাকে শাস্তি দিন। আমি দাদাকে না বলে তাঁর গাছের ফল খেয়েছি, সুতরাং আমি চোর। আমাকে চোরের সাজা দিন।'

রাজার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে বললেন, 'ভগবন্, রাজা যেমন চোরকে সাজা দিয়ে থাকেন, তেমনি তাকে ক্ষমা করবার অধিকারও তাঁর আছে। আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম।'

লিখিত কিন্তু সে ক্ষমা গ্রহণ করলেন না। তিনি সাজা নিতেই চান, নইলে তাঁর পাপ মোচন হবে না। শেষ পর্যন্ত রাজা বাধ্য হয়ে, গভীর শোকের সঙ্গে লিখিতকে চোরের যা সাজা তাই দিলেন। সেকালে চোরের হাত কেটে ফেলে দেওয়া হত, যাতে সে আর কখনো চুরি করতে না পারে। লিখিতকেও সেই দণ্ড দেওয়া হল। আর কিছুতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না।

লিখিতের কাটা হাত দেখে শঙ্খ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে তিনি ভাবেন নি। চোখের জল মুছে, তিনি বললেন, 'ভাই' আমি রাগ করে ও-কথা বলিনি। তোমার পাপ দূর করার জন্যেই বলেছিলাম। এখন পাপ দূর হয়েছে, তুমি আমাদের এই নদীতে দেবতা, ঋষি আর পিতাদের তর্পণ করে শুদ্ধ হও।'

লিখিত তখনি নদীতে স্নান করে, তর্পণ করতে বসলেন। তর্পণের জন্য ছুটি হাতের দরকার হয়। তর্পণ করতে গিয়ে লিখিত আশ্চর্য হয়ে দেখলেন তার ছুটি সুন্দর সুস্থ হাত রয়েছে! আনন্দিত মনে তিনি কাজ শেষ করলেন। তারপর দাদাকে হাত ছুটি দেখালেন। শঙ্খ বললেন, 'এতে আশ্চর্যের কি আছে? আমি তপস্যা-বলে তোমার হাত ফিরিয়ে দিয়েছি।'

লিখিত বললেন, 'দাদা' তোমার তপস্যার এত বল! তাহলে পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্যে আমাকে রাজার কাছে মিছিমিছি পাঠালে কেন? তুমি নিজেই তো আমাকে শুদ্ধ করে দিতে পারতে।'

শঙ্খ বললেন, 'ভাই' রাজার কাজই হল দেশের নিয়ম রক্ষা করা। তোমাকে সাজা দেওয়াতে তোমার পাপ-ও দূর হল, তিনিও নিজের কর্তব্য করলেন। সকলেরই মঙ্গল হল।'

এই হল শঙ্খ ও লিখিতের কথা। এবার নচিকেতার গল্প বলি।

সেকালে উদ্দানকি নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁর ছেলের নাম ছিল নচিকেতা।

উদ্দানকি একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। একদিন নদীতে গিয়ে স্নান করে, নদীর ধারেই পুজোর আসন আর অন্যান্য উপকরণ সাজিয়ে নিবিষ্ট মনে পুজো শেষ করে, আশ্রমে ফিরে এলেন। নদীর তীরে কাঠ, কলসি, ফুল, ফল ইত্যাদি পড়ে রইল।

বাড়ি এসে সে কথা মনে পড়তেই নচিকেতাকে ডেকে বললেন, 'বাছা' আমি পুজো সেরে চলে এসেছি, কিন্তু পুজোর আর রাঁধাবাড়ার জিনিসপত্র নদীর ধারেই ফেলে এসেছি। যাও তো বাবা, সেগুলি নিয়ে এসো।'

ততক্ষণে নদীর জল বেড়ে গিয়েছিল। তার স্রোতে উদ্দানকির সব জিনিস ধুয়ে ভেসে চলে গিয়েছিল। নচিকেতা ফিরে এসে বাবাকে সে কথা বলতেই, তিনি রেগে উঠলেন। শরীর একে ক্লান্ত, তার উপর এত বেলা অবধি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নেই। রাগ হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু রাগের মাথায় ঋষি ছেলেকে বড়ই নিষ্ঠুর কথা বলে বসলেন, 'এখনি তোমার সঙ্গে যমের দেখা হোক!' এ-কথা শুনে নচিকেতা স্তম্ভিত হলেন। বাপের পায়ে পড়ে শুধু বললেন, 'বাবা' আমাকে দয়া করুন—' আর কিছু বলা হল না। বাপের কথা ফলে গেল, নচিকেতা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তখন বাপের মনের অবস্থা দেখে পাষাণেরও বুক ফেটে যায়। কিন্তু তখন কেঁদেও কোনো লাভ নেই। এদিকে নচিকেতা ততক্ষণে যমরাজের পুরীতে পৌঁছে গিয়েছেন। বিশাল পুরী, বিশাল রাজসভা। সে সভা সোনা দিয়ে তৈরি, সহস্র যোজন লম্বা। যম হলেন ধর্মরাজ। তিনি সোনার সিংহাসনে বসে, ন্যায়-দণ্ড হাতে নিয়ে পাপ-পুণ্যের বিচার করছেন।

নচিকেতাকে দেখে যম তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। অনুচরদের আদেশ করলেন, 'ইনি যে-সে লোক নন্। ইনি অতি পিতৃভক্ত আর পুন্যবান। এঁকে মণিমুক্তোর থালা এনে উপহার দাও।'

যমের সৌজন্যে নচিকেতা বড়ই আনন্দিত হয়ে বললেন, 'যমরাজ'

এই তো আমি আপনার দেশে এসেছি। এবার আমি যেখানে থাকার উপযুক্ত আমাকে সেইখানে পাঠিয়ে দিন।'

সস্নেহে হেসে যম বললেন, 'বাছা' তোমার তো মৃত্যু হয়নি। তোমার বাবা অতিশয় তেজস্বী। তিনি তোমাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। আমি তো তার কথা অমান্য করতে পারি না, তাই তোমাকে এখানে এনেছি। এবার দেখা হয়ে গেল, তুমি সন্তুষ্ট মনে বাড়ি ফিরে যাও। যাবার আগে কি বর চাও বল।'

নচিকেতা বললেন, 'পুণ্যবানরা আপনার দেশে এসে কি ভাবে থাকেন তা দেখতে ইচ্ছা করে।'

যম তখন নচিকেতাকে উজ্জ্বল রথে চড়িয়ে সেখানে নিয়ে গেলেন। নচিকেতা দেখলেন যে যেমন পুণ্যবান, সেই রকম সুখে তাকে রাখা হয়েছে। সে বড় সুন্দর দেশ। মনে হল যেন স্বপ্নের রাজ্যে এসেছেন। মিষ্টান্নের পাহাড়, দুধের নদী, ঘিয়ের হ্রদ দেখলেন। সেকানকার গাছের কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। চমৎকার সব বাড়িঘর ; সে বাড়ি মাটিতেও থাকে, আকাশেও ওড়ে, জলেও ভেসে চলে। দেখে দেখে নচিকেতার কি আনন্দ।

তার উপর যমরাজের অমূল্য উপদেশ প্রাণভরে শুনলেন। সমস্ত দেনা শেষ হলে বিনয়ের সঙ্গে যমকে প্রণাম করে, নচিকেতা বিদায় নিলেন। যমের অনুচররা তাঁকে উদ্দানকির আশ্রমে পৌঁছে দিল।

এদিকে মহর্ষি উদ্দানকির মনের অবস্থা কল্পনা করা যায় না। নিষ্পন্দ ছেলেকে কোলে নিয়ে তাঁর সারা দিন, সারা রাত কেটেছে। চোখের জলে ছেলের দেহ ভিজে গিয়েছে। ভোর হয়ে এল, এমন সময় কি এক অপূর্ব সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নচিকেতার হাত-পা একটু নড়ল, চোখের পাতা কাঁপল, চোখ মেলে তিনি উঠে বসলেন।

বিস্ময়ে আনন্দে উদ্দানকির মুখে কথা নেই। আর কখনও তাঁর মুখ দিয়ে অকারণে নিষ্ঠুর কথা বেরোয় নি। নচিকেতার মনেও কোনো অভিমান ছিল না। বরং তাঁর বড় আনন্দ যে বাবা অমন শাপ দিয়েছিলেন বলেই জীবিত অবস্থায় তিনি যমরাজার অপরূপ দেশ দেখে

আসার সুযোগ পেয়েছিলেন।

নচিকেতার যমরাজার দেশে যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে নানারকম গল্প শোনা যায়। এ কাহিনী তারই একটি। পুরাকালে ভারতবাসীদের আদর্শ বিষয়ে আরো অনেক গল্প আছে, তার মধ্যে শুকদেবের কথা সবচেয়ে মধুর। সে গল্প বলি শোন।

কর্ণিকার হল সোঁদাল গাছ। তার ফুলের যেমন শোভা, তেমনি সুগন্ধ। সুমেরু পাহাড়ের চূড়োয় নাকি কর্ণিকার বাহার দেখলে মুগ্ধ হতে হত। সুমেরু পাহাড় যে কোথায় তা কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। কেউ বলে চীনে—তুর্কিস্তানে, কেউ বলে উত্তরমেরুর শিখর। তবে পুরাণে যেমন লেখা আছে, তাতে মনে হয় সে দেশের আর তুলনা নেই। এতই অপূর্ব সে পর্বত যে একবার শিব পার্বতী কৈলাস ছেড়ে, সেখানেই কিছুদিন ছিলেন।

সেই সময় ব্যাসদেব সেখানে গিয়ে শুধু বাতাস খেয়ে অতি কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন। শিবের কাছে তাঁর প্রার্থনা তাঁর যেন দেবতাদের মতো গুণী, অতি ধার্মিক এক ছেলে হয়। এক বছর ধরে ঐ ভাবে তপস্যা করার পর দেখা গেল তপস্যার তেজে তাঁর জটা আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে।

অবশেষে শিবের দয়া হল। তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন, 'বৎস' শীঘ্রই তুমি অতুলনীয় ছেলে লাভ করবে। আগুন, জল, পৃথিবী, আকাশ আর বাতাস যেমন পবিত্র, তার মনও তেমন হবে। তোমার ছেলে তার সমস্ত দেহ মনপ্রাণ, ভগবানের কাছে নিবেদন করবে। ত্রিভূবনে তার অক্ষয় নাম হবে।'

ব্যাসদেবের নাম দ্বৈপায়ন। বর পেয়ে আনন্দিত হয়ে শিবকে প্রণাম করে, তিনি হোমের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। হোম করতে হলেই আগুনের দরকার। সেকালে আগুন জ্বালাতে হলে, হয় দুটি চক্‌মকি পাথর ঠুকে শুকনো কাঠকুটো ধরাতে হত, নয়তো দুটি কাঠ এক সঙ্গে ঘষতে হত। ঐ কাঠকে বলে অরণি। ব্যাসদেব অরণি ঘষছেন, এমন সময় কাঠের ভিতর থেকে আগুনের মতো জ্যোতির্ময় পরম সুন্দর এক

ছেলে বেরিয়ে এলেন। ইনিই সেই পুত্র। এঁর নাম হল শুক।

তিনি জন্মালে গঙ্গাদেবী এসে পবিত্র জলে তাঁকে স্নান করালেন। স্বর্গ থেকে হরিণের চামড়ার আসন আর দণ্ড নেমে এল। এ সব সন্ন্যাসীদের ব্যবহারের জিনিস। স্বর্গ থেকে জয়ধ্বনি শোনা গেল, পুষ্পবৃষ্টি হল। শিব-পার্বতী শুকদেবের গলায় পৈতে দিলেন। ইন্দ্র অতি সুন্দর কমণ্ডলু আর দেবতাদের যোগ্য কাপড় দিলেন। হাঁস, বক, সারস আর শুকপাখিরা আনন্দে নাচতে লাগল।

যিনি সন্ন্যাসী হয়েই জন্মেছিলেন, এই সব উপহারই তাঁর উপযুক্ত। পার্থিব সুখের জিনিসে তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাঁর মনে ভগবানের চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা ছিল না। শৈশবেই তিনি বৃহস্পতির ছাত্র হলেন আর অল্প দিনের মধ্যেই সব রকম জ্ঞান আয়ত্ত করে ফেললেন। যা পড়েন তাই শেখা হয়ে যায়।

তারপর তিনি তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর তপস্যা দেখে দেবতা মানুষ সকলেই আশ্চর্য হয়ে যেতেন। দেখতে দেখতে তিনি ত্রিভুবনের ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করলেন। এ-সবেও তাঁর মন উঠল না। তিনি আসল জিনিস চাইতেন, ভগবানকে চাইতেন, আত্মার মুক্তি চাইতেন।

ব্যাসের কাছে গিয়ে শুকদেব বললেন, 'বাবা, আমাকে মুক্তির পথ বলে দিন।'

এই তো চেয়েছিলেন ব্যাস, এমন ছেলে যে শ্রেষ্ঠ জিনিস ছাড়া আর কিছু চাইবে না। তিনি তখন ছেলেকে যত্ন করে শাস্ত্রে লেখা সব রকম মুক্তির পথ শেখাতে লাগলেন। সে শিক্ষা শেষ হলে, শুকদেবকে বললেন, 'এবার মিথিলার রাজা জনকের কাছে যাও, তিনি বাকি শিক্ষা দেবেন। আমরা তাঁদের গুরুবংশীয়, কিন্তু তুমি তাঁকে গুরুর মতো দেখবে।'

সুমেরু থেকে ভারতবর্ষে যেতে হলে ইলাবৃতবর্ষ পার হতে হয়। অনেকের মতে এই দেশ হল মঙ্গোলিয়া। তারপর হরিবর্ষ বলে এক দেশ ; তারপর কিন্নর দেশ পার হতে হয়। কত দুর্গম পাহাড়, দুরন্ত নদী, দুস্তর মরুভূমি পেরিয়ে, তবে শুকদেব ভারতবর্ষের আর্যাবর্তে বিদেহ

রাজ্য ; তার রাজধানী মিথিলা। রাজর্ষি জনক সেখানে রাজত্ব করেন। প্রাসাদের সিং দরজায় শুকদেব এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দেহ থেকে পবিত্রতা ঝড়ে পড়তে লাগল। কিন্তু দ্বার-রক্ষকরা তা লক্ষ্য করল না। অতি কর্কশ ভাষায় তারা তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দিল না।

শুকদেবের শরীর খিদেয় তেষ্টায় ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল। তবু তিনি ধৈর্য ধরে দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ ভগবানের চিন্তায় ডুবে রইল। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করত না। তিনি নীরবে সেই প্রখর রোদে অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রহরীদের একজনের মন অন্য রকম ছিল। সে বুঝতে পারল এই পথিক কোনো মহাপুরুষ হবেন। তখন কাছে এসে জোড় হাতে ক্ষমা ভিক্ষা করে সে তাঁকে ভিতরের মহলে নিয়ে গেল। সেখানে মন্ত্রী ছিলেন। তিনি শুকদেবকে দেখেই ছুটে এলেন। মহা সম্মানে তাঁকে রাজা জনকের কাছে নিয়ে গেলেন। জনক রাজা দেখেই বুঝলেন তাঁর দেবতুল্য অতিথি অতিশয় ক্লান্ত। সঙ্গে সঙ্গে তার বিশ্রামের আর আপ্যায়নের চমৎকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ভালো ঘর, নরম বিছানা, সুগন্ধী বাতাস, শীতল জল, নানা সুস্বাদু, মৃদু মধুর সঙ্গীত, কোনো কিছুর অভাব হল না। কিন্তু সেই দেবসদৃশ পুরুষ এ-সব লক্ষ্য করলেন কিনা সন্দেহ। সেই আরামের ব্যবস্থার মাঝখানে তিনি সারারাত ভগবৎ চিন্তায় কাটালেন।

পরদিন সকালে জনক এসে শুকদেবকে অশেষ শ্রদ্ধা আর সম্মান দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবন্, বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি। এত কষ্ট করে কেন আমার কাছে এসেছেন?'

শুকদেব বললেন, 'আমার বাবা বলেছেন আপনি আমাকে মুক্তির কথা শোনাবেন।' তখন জনক পরম আহ্লাদে তাঁকে মুক্তি বিষয়ে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশ লাভ করে শুকদেব ধন্য হয়ে গেলেন। তারপর মহর্ষি জনককে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়ে শুকদেব আবার সেই কঠিন পথ পার হয়ে বাবার কাছে পৌঁছলেন।

ব্যাসদেব তাঁর শিষ্যদের তখন বেদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। জনকের

সৌজন্যের কথা শুনে তিনি বড়ই খুশি হলেন। ব্যাসের শিষ্যরা চলে গেলে, শুকদেব তাঁর কাছে বসে আরো ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করলেন। নারদ এসেছিলেন, তিনিও তাঁকে নানা উপদেশ দিলেন। এই ভাবে গভীর জ্ঞান অনুশীলন আর ধ্যানধারণা করে কিছুদিন কাটবার পর, শুকদেবের মনের মধ্যে মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়ে এল।

তখন তাঁর মনে হতে লাগল সংসার অতি অসার। যোগ বলে দেহ ছেড়ে এই জগতের চেয়ে অনেক উন্নত এক জগতে চলে গেলে ভালো হয়।

নিজের মনে এই সঙ্কল্প করলেন শুকদেব, বাবাকে বললেন, আমি আর সংসারে থাকতে চাই না। যোগবলে এর চেয়ে ভালো জায়গায় চলে যেতে চাই।'

শুকদেবের জন্মের আগে এই রকম ধর্মপ্রাণ ছেলেই চেয়েছিলেন ব্যাসদেব। এখন তাঁকে ছাড়বার শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলে,ছেলের প্রতি গভীর স্নেহে তাঁর মন ভরে গেল। তিনি বললেন, 'এখনি যেও না। আরেকটুক্ষণ দেখি তোমাকে।' কিন্তু তখন আর তাঁকে বাধা দেওয়া গেল না। বাবার কথায় শুকদেবের মন টলল না। তিনি ক্রমাগত কৈলাস পাহাড়ের দিকে চললেন। সেই পাহাড়ের শিখরে বসে ধ্যান করতে করতে তাঁর পবিত্র আত্মা মুক্তি পেল।

বাতাসের মতো হাল্কা হয়ে তিনি ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে চললেন। তাঁর সেই উজ্জ্বল সত্তা সূর্যের মতো আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি বুঝলেন যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় ভগবান রয়েছেন। দেবতারা তাঁর যাত্রাপথে ফুল ছড়াতে লাগলেন। অপ্সরারা তাঁকে দেখে আক্ষেপ করতে লাগলেন, 'আহা, এই বয়সে মা-বাবাকে ছেড়ে এ কোন মহাপুরুষ চলেছেন ?'

সে-কথা শুকদেবের কানে যেতেই, তিনি গাছ লতা নদী পাহাড় অন্তরীক্ষকে ডেকে বললেন, 'বন্ধুরা, আমি এই পথে যাচ্ছি। বাবা এসে আমাকে ডাকলে, তোমরা উত্তর দিও। তাহলে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন।

মেরু পর্বতের কাছে সোনা-রূপোর দুই চুড়ো। শুকদেব সেখানে পৌঁছলে, দুই চুড়ো দুই ভাগ হয়ে তাঁকে যাবার পথ করে দিল। ব্যাসদেব যখন পৌঁছলেন, সেখানকার মহর্ষিরা শুকদেবের আশ্চর্য প্রয়াণের কথা বলতে লাগলেন, শুনে ব্যাসদেবের শোক উথলে উঠল। তিনি হা বৎস! হা বৎস! বলে ডেকে উঠলেন। আর পাহাড় পর্বত অন্তরীক্ষ অমনি সাড়া দিল 'ভো! ভো!' আজ পর্যন্ত পাহাড় নদী অন্তরীক্ষের কাছে ডাক দিলে, তারা উত্তর দেয়। আমরা বলি প্রতিধ্বনি।

সমাপ্ত